POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا
فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ؕ
وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا ○

যে কেহ ইহকালের পুরস্কার চাহিবে তাহা হইলে (সে যেন স্মরণ রাখে যে) আল্লাহ্‌র নিকট ইহকাল ও পরকালের পুরস্কার রহিয়াছে এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

(সূরা নিসা, আয়াত: ১৩৫)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 1
সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

7 জানুয়ারী, 2021 ● 22 জামাদিউল আওয়াল 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.)=এর দোয়ার নিদর্শন

৯৩৩) হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) এর যুগে অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। এরই মাঝে নবী (সা.) জুমার দিন খুতবা প্রদান করছিলেন। এক বেদুউন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হে রসুলুল্লাহ্! জীবজন্তু মারা গেছে আর সন্তানেরা ক্ষুধার্ত। আপনি আমাদের জন্য দোয়া করুন। আঁ হযরত (সা.) হাত তুলে দোয়া করলেন। সেই সময় আকাশে এক টুকরো মেঘও দেখা যাচ্ছিল না। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ আছে। তিনি (সা.) হাত নামিয়ে আনার পূর্বেই পাহাড় সদৃশ মেঘের আবির্ভাব হল। আর তিনি মেম্বর থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত নেমে এলেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি বৃষ্টি বিন্দু তাঁর দাড়ি বেয়ে চুইয়ে পড়তে দেখলাম। সেই দিন সারাক্ষণ বৃষ্টি হতে থাকে, পরের দিন এবং তার পরের দিন। এরপরের দুই দিনও পরের জুমা পর্যন্ত বৃষ্টি অব্যাহত থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সেই একই বেদউন বা অন্য কোনও ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হে রসুলুল্লাহ্! ঘরবাড়ি ভেঙে পড়েছে, জীবজন্তু ডুবে মরছে। আপনি আমাদের জন্য দোয়া করুন। তিনি (সা.) হাত তুলে দোয়া করলেন: হে আল্লাহ্! আমাদের আশপাশে (বৃষ্টি) হোক, আমাদের উপর যেন না হয়। তিনি মেঘের যে কোণার দিকে ইঙ্গিত করতেন, সেটিই বিদীর্ণ হয়ে যেত। মদীনা পুকুর সদৃশ জলাশয়ে পরিণত হয়েছিল। 'কানাত' নালা দিয়ে এক মাস অবধি জল বয়ে যেতে থাকে। (বুখারী, কিতাবুল জুমআহ)

এই সংখ্যায়

মসীহ মওউদ (আ.)- চ্যালেঞ্জ
খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২০ নভেম্বর ২০২০
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত

ইদানিং কালের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে প্লেগের মুলে রয়েছে সূক্ষ্ম ব্যাকটেরিয়া। এই গবেষণাটি আমারও পছন্দ হয়েছে। কেননা, এর দ্বারা রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর শ্রেষ্ঠত্ব ও সত্যতা প্রমাণিত হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা দ্বারা ইসলামের সমর্থন

ইদানিং কালের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে প্লেগের মুলে রয়েছে সূক্ষ্ম ব্যাকটেরিয়া। এই গবেষণাটি আমারও পছন্দ হয়েছে। কেননা, এর দ্বারা রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর শ্রেষ্ঠত্ব ও সত্যতা প্রমাণিত হয়। হাদীসে যেখানে এর উল্লেখ রয়েছে, সেখানে এর নাম দেওয়া হয়েছে 'নাগাফ'। 'নাগাফ' বলা হয় সেই পরজীবীকে যা ছাগল ও উটের নাকে বাসা বাঁধে। আর এটিকে প্লেগ নাম দেওয়া হয়েছে। বর্তমান যুগের গবেষণার বিষয়ে অনেক দম্ভ করা হয়। কিন্তু যারাই পবিত্র ইসলামের প্রবর্তক আঁ হযরত (স.)-এর বাণী অধ্যায়ন করেছে, তারা একথা জেনে পুলকিত ও চমতকৃত হয় যখন জানতে পারে যে এই কথাগুলি তেরোশ বছর পূর্বে তাঁর পবিত্র মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল। প্লেগের প্রসঙ্গ এলে কুরআন করীমও এটিকে কীট নামে উল্লেখ করেছে।

হে গর্বিত আধুনিক গবেষকেরা! দোহাই তোমাদের,একটু সাধুতা অবলম্বন কর এবং বল যে, সেই ধর্ম কি মানুষের পরিকল্পনার ফসল হতে পারে যা ইতিপূর্বেই এমন নিগুঢ় সত্য উদ্ঘাটন করে রেখেছে যেগুলি তেরোশো বছরের পরিশ্রম ও গবেষণার পরিণামে আজ আমরা জানতে পারছি? এটি হল কুরআন করীম এবং আমাদের নবী (সা.)-এর বৌদ্ধিক নিদর্শনের নমুনা। লক্ষ্য করে দেখ! 'কালব' বলা হয় হৃদয়কে আবার এমন বস্তুকে বোঝায় যা সংবহনের কাজে সহায়তা করে।

হৃদপিণ্ডের উপরই নির্ভর করে রক্তের সংবহন প্রক্রিয়া। দীর্ঘকালের পরিশ্রম এবং সাধনার পর আজকের গবেষণা রক্ত সংবহনের খুঁটিনাটি জানতে পেরেছে কিন্তু ইসলামে ইতিপূর্বেই হৃদপিণ্ডের নাম 'কালব' রাখা হয়েছে। আর কেবল তা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতই করে নি, বরং তা সংরক্ষণ করেও রেখেছে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৩৬-২৩৭)

যে খোদা তোমাদেরকে জড় থেকে জীবন্ত করেছেন, অতঃপর মৃত্যু দান করেন, তিনি নাকি মৃত্যুর পর নতুন জীবন দান করবেন না-তাঁর সম্পর্কে এই ধারণা করা অযৌক্তিক

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ
بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ
يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

এর তফসীরে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-"এই আয়াতে বলা হয়েছে, যে খোদা তোমাদেরকে জড় থেকে জীবন্ত করেছেন, অতঃপর মৃত্যু দান করেন, তিনি নাকি মৃত্যুর পর নতুন জীবন দান করবেন না-তাঁর সম্পর্কে এই ধারণা করা অযৌক্তিক। আর যদি অপর এক জীবন লাভ হওয়া নির্ধারিত থাকে, তবে হিদায়াতও তাঁর পক্ষ থেকে অবশ্যই আসা চায় যাতে মানুষ পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে। কি অসাধারণ সরল ও সূক্ষ্ম প্রমাণ! এক নিষ্প্রাণ বস্তুকে জীবন দান করার আল্লাহ্ তা'লার কিসের প্রয়োজন ছিল, যদি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য তার না থাকত? ধরেই নাও যে কোন উদ্দেশ্য ছিল না, তবে এক বুদ্ধিমান ও অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন সত্তাকে সৃষ্টি করে তিনি মৃত্যু কেন দিলেন? যদি এই জগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য মানুষের জন্য নির্ধারিত ছিল, তবে এত দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাকে জীবন দান করার পর আবার মৃত্যু কেন দিলেন? যদি না এই মৃত্যুর পর আরও এক উৎকৃষ্টতর আধ্যাত্মিক জীবন উদ্দিষ্ট ছিল?

এই আয়াতে সেই সব লোকেদের আপত্তির খণ্ডণ করা হয়েছে, যারা মনে করে যে মৃত্যুর পর কবরের আযাব বলে কিছু নেই। বরং সরাসরি জান্নাত বা দোযখেই উত্তরণ ঘটবে, অবশ্য তা যদি সত্যিই থেকে থাকে। কেননা এতে পাঁচটি যুগের উল্লেখ আছে। একটি হল জড় অবস্থার উল্লেখ। দ্বিতীয় জাগতিক জীবন, তৃতীয় শারিরিক মৃত্যুর যুগ, চতুর্থ আরও এক নতুন জীবনকাল এবং এরপর সেই যুগ আসে যখন মানুষ খোদা তা'লার সমক্ষে উপস্থিত হবে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর সমবেত হওয়ার পর জীবন এবং জীবনের পর 'সুম্মা' শব্দ ব্যবহার করে 'ইলাইহে তুরজাউন' থেকে বোঝা যায় যে, মৃত্যুর অব্যবহিত পরে এক ধরণের জীবন লাভ হয়, কিন্তু 'হাশর' পরবর্তীকালে সংঘটিত হয়। .... কুরআন করীমের আরও একটি আয়াত স্পষ্ট ভাষায় এই শাস্তির কথা উল্লেখ করেছে। (সূরা মোমেন-রুকু-৫) ফিরাউনের জাতিকে সকাল সন্ধ্যা দোযখের সামনে আনা হয়। আর যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তখন বলা হবে, ফিরাউনের জাতিকে কঠিন আযাবে নিক্ষেপ কর। এই আয়াত থেকে প্রকাশ পায় যে, দোযখে প্রবেশ করার পূর্বে ফিরাউন জাতি শাস্তি পেতে থাকবে আর কুরআন করীম অবতীর্ণ হওয়ার সময়ও তারা শাস্তি পাচ্ছিল।

(তফসীরে কবীর, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬৫-২৬৬)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

হযরত মসীহ মওউদ (আ)-এর পুরস্কার সম্বলিত চ্যালেঞ্জ

আমি প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আহ্বান করেছি

إِنَّ السُّمُوْمَ لَشَرُّ مَا فِي الْعَالَمِ ۞ شَرُّ السُّمُوْمِ عَدَاوَةُ الصُّلَحَاءِ

মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবীর জন্য এক হাজার রুপী পুরস্কারের চ্যালেঞ্জ, যদি তিনি প্রমাণ করতে পারেন যে, 'আদ দাজ্জাল' বলতে প্রতিশ্রুত দাজ্জালকে বোঝানো হয় নি।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর পুরস্কার ঘোষণার চ্যালেঞ্জটি তাঁর রচনা 'ইযালায়ে আওহাম' থেকে উপস্থাপন করছি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইযালায়ে আওহাম পুস্তকে 'মুবাহাসা লুধিয়ানা সম্পর্কেও কয়েকটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। আর মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবীকে মুবাহাসার সময় যে চ্যালেঞ্জ তিনি জানিয়েছিলেন, তা এই পুস্তকে আরও বেশি দৃঢ়ভাবে নতুন করে উপস্থাপন করেন। লুধিয়ানার মুবাহাসা সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং মৌলবী মহম্ম হোসেন বাটালবীর মাঝে সংঘটিত হয়েছিল ১৮৯১ সালের ২০-৩১ শে জুলাই। এই মুবাহাসা পরে 'আল হক মুবাহাসা লুধিয়ানা' নামে প্রকাশিত হয় যা রূহানী খাযায়েনের ৪র্থ খণ্ডের প্রথম পুস্তক। সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবীকে মোবাহাসার সময় চ্যালেঞ্জ করেন যে, আপনি যদি প্রমাণ করতে পারেন যে হাদীসে 'আদ দাজ্জাল' বলতে প্রতিশ্রুত দাজ্জাল নয়, তবে আমি আপনাকে পাঁচ রুপি পুরস্কার দিব। ইযালায়ে আওহাম পুস্তকে এই পুরস্কার রাশি বাড়িয়ে ৫০ রুপী এবং পরে একহাজার রুপী করা হয়।

মুবাহাসা আল হক লুধিয়ানার প্রকৃত বিষয়বস্তু ছিল 'ঈসা (আ.)-এর জীবন ও মৃত্যু। কিন্তু মৌলবী মহম্মদ হোসেন সাহেব শেষ পর্যন্ত এই আসল বিষয়ের দিকে আসেন নি। আর পুরো মুবাহাসাটিকে কেবল এই বিষয়ের মধ্যে আঁটকে রাখেন যে হাদীসের প্রকৃত মর্যাদা কি আর বুখারী ও মুসলিমের সমগ্র হাদীস সঠিক এবং পালনযোগ্য কি না? মৌলবী সাহেব জানতেন যে, যদি তিনি প্রকৃত বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন, তবে তার জন্য অশেষ লাঞ্ছনা অপেক্ষা করছে, কেননা, ঈসা (আ.)–এর মৃত্যুর বিষয়ে কুরআন মজীদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহের সামনে তিনি এক মুহূর্তের জন্যও টিকতে পারবেন না।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবীর প্রশ্নের উত্তরে কুরআন করীম এবং হাদীস সম্পর্কে নিজের ধর্মবিশ্বাসকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

"কিতাব ও সুন্নতের মধ্যে চূড়ান্ত বিধান হওয়ার বিষয়ে আমার বিশ্বাস, আল্লাহ্‌র কিতাব অগ্রগণ্য এবং নেতা। যদি কোনও বিষয়ে আঁ হযরত (সা.)-এর হাদীসের অর্থ কিতাবুল্লাহ্‌র পরিপন্থী না হয়,তবে সেই অর্থ চূড়ান্ত বিধান হিসেবে গৃহীত হবে। কিন্তু যে অর্থ কুরআন শরীফের স্পষ্ট বর্ণনার পরিপন্থী হয়ে দেখা দেয়, সেই অর্থগুলিকে আমরা কোনও ক্রমেই স্বীকার করব না। বরং আমাদের জন্য যতদূর সম্ভব হবে, আমরা সেই হাদীসের এমন অর্থ করব যা কিতাবুল্লাহ্‌র স্পষ্ট বর্ণনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। আর আমরা যদি এমন কোনও হাদীস পাই যার সঙ্গে কুরআনের বর্ণনার সরাসরি সংঘাত দেখা দেয়, আর কোনওভাবেই আমরা সেটির ব্যখ্যা করতে সক্ষম না হই, তবে এমন পরিস্থিতিতে সেই হাদীসকে আমরা 'মোজু' বা সন্দেহযুক্ত আখ্যা দিব। কেননা আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলেন, فَبِأَيِّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ○

(আল হক মুবাহাসা লুধিয়ানা, রুহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ১১)

এমন স্পষ্ট ভাষ্য সত্ত্বেও মৌলবী মহম্মদ হোসেন সাহেব বারবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সম্পর্কে একথাই বলতে থাকেন যে, আপনি আমার প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিলেন না। একথা শুনে মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব সিয়ালকোটী (রা.) মৌলবী মহম্মদ হোসেন সাহেব বাটালবীকে সম্বোধন করে টিকাতে লেখেন- "মৌলবী সাহেব! আপনার এই হঠকারিতা কমবে কি? নিজের মনকে বিদ্বেষ ও বৈরিতার আবেগ থেকে কিছুক্ষণের জন্য মুক্ত করে দেখুন, আপনি স্পষ্ট জানতে পারবেন যে, আপনাকে স্পষ্ট এবং যথেষ্ট উত্তর দেওয়া হয়েছে।"

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর স্পষ্ট বর্ণনা এবং স্পষ্টীকরণ সত্ত্বেও চতুর্থবার যখন মৌলবী মহম্মদ হোসেন সাহেব নিজের উত্তরে বললেন, "আমার আক্ষেপ এই যে, আপনি এখনও আমার প্রশ্নের স্পষ্ট ভাষায় উত্তর দিলেন না।" একথা শুনে হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সিয়ালকোটী (রা.) বাধ্য হয়ে লিখলেন, "আপনার এই আক্ষেপ শেষই হচ্ছে না আর হয়তো মৃত্যু (অর্থাৎ মুবাহাসা শেষ হওয়া না হওয়া) পর্যন্ত এই আক্ষেপ থেকে মুক্তি মিলবে না। বেশ দেখুন।"

কুরআন এবং হাদীসের মর্যাদা সম্পর্কে সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিশ্বাস কিরূপ স্পষ্ট ও কুরআনের শিক্ষা সম্মত ছিল তা এই বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়। তিনি লেখেন-

"আমি সত্য অন্তঃকরণে এবিষয়ের উপর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হাদীসসমূহ যাচাই করার জন্য কুরআন করীমের উর্দ্ধে অন্য কোনও মানদণ্ড আমাদের কাছে নেই। কিছু হাদিস বিশারদ নিজের মত করে প্রথাগত অবস্থাকে দুর্বল ও সঠিক হাদীস নির্ধারণের মাপকাঠি আখ্যায়িত করেছেন ঠিকই, কিন্তু কখনই তারা এমন দাবি করেন নি যে, এই মাপকাঠি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তা কুরআন করীমকে উপেক্ষা করে। "

কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেবের বিশ্বাস হল, কুরআন হাদীসের স্বাস্থ্য যাচাই করার কোনও মাপকাঠি নয়। তাঁর নিকট হাদীসের স্বাস্থ্য যাচাই করার মানদণ্ড হল হাদীসের বর্ণনার নিয়মাবলী। যে হাদীস রেওয়াতের নিয়ম অনুযায়ী, সেগুলি সঠিক এবং আমলযোগ্য, আর তা কুরআন করীমের পরিপন্থী হতে পারে না। অতএব হাদীসের স্বাস্থ্য যাচাইয়ের মানদণ্ড হল রেওয়াতের নিয়মাবলী। কুরআন করীমের দিকে তাঁর মনোযোগ দেওয়ার এবং কুরআনের দ্বারা যাচাই করার প্রয়োজন নেই।

মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেবের এই বিশ্বাসের উত্তরে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,

" আর যাইহোক বুখারী ও মুসলিম-এর উপর ওহী তো নাযেল হত না, বরং যে পদ্ধতিতে তাঁরা হাদীসসমূহ একত্রিত করেছেন, সেদিকে দৃষ্টি দিলে জানতে পারব যে, নিঃসন্দেহের সেই পদ্ধতি ছিল অনুমান ভিত্তিক। ..... আপনি যতই বলুন যে, যদি কোনও ব্যক্তি বুখারীর কোন হাদীসকে ভুল বলে অস্বীকার করে, যেমনটি অধিকাংশ অনুবাদক অস্বীকার করে থাকে। সেক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি কি আপনার মতে কাফের বলে গণ্য হবে? তবে যে পরিস্থিতিতে সে কাফের হতে পারে না, সেক্ষেত্রে আপনি কিভাবে হাদীসসমূহকে বর্ণনার প্রমাণের দৃষ্টিকোণ থেকে সন্দেহের উর্দ্ধে বলে গণ্য করতে পারেন? আর যেহেতু হাদীসসমূহ নিশ্চিত নয়, এমতাবস্থায় আমরা যদি কোন হাদীসকে কুরআন করীমের পরিপন্থী পাই এবং স্পষ্ট দেখি যে সরাসরি কুরআন করীমের বর্ণনার সঙ্গে সংঘাত তৈরী করছে আর কোনভাবেই সামঞ্জস্য দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, তখন কি আমরা কুরআন করীমের সেই আয়াতটিকে বিশ্বাসের স্থান থেকে নামিয়ে রাখব? নাকি ঐশী বাণী কি না সে বিষয়ে সন্দেহে নিপতিত হব? এক্ষেত্রে করণীয় কি? এটাই তো করতে হবে যে, যদি কোন হাদীস কোনভাবে ঐশী কালামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, তবে নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে সেটি 'ওজী' আখ্যায়িত করব।"

কুরআনকে মানদণ্ড এবং বিচারক হিসেবে গ্রহণ করার একটি প্রধান কারণ এটিও যে, হাদীসে অনেক বেশি স্ববিরোধ পাওয়া যায়। এর একটি উদাহরণ দিতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- "ইবনে সিয়াদ-এর প্রতিশ্রুত দাজ্জাল হওয়ার বিষয়ে যে হাদীসগুলি রয়েছে, সেগুলির সঙ্গে সেই সব হাদীসের সরাসরি এবং স্পষ্ট সংঘাত রয়েছে, যা খৃষ্টীয় দাজ্জাল প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে আর বর্ণনাকারী হল তামীম দারী। এখন আমরা এই দুই হাদীসের মধ্যে থেকে কার হাদীসটিকে সঠিক মনে করব? উভয় হাদীসই হযরত মুসলিম সাহেবের সহীহ হাদীসে বিদ্যমান। ইবনে সিয়াদ এর দাজ্জাল হওয়ার বিষয়ে এত বেশি সমর্থন পাওয়া যায় যে, হযরত উমর (রা.) আঁ হযরত (সা.)এর সমক্ষেই শপথ নিয়ে বলেছিলেন, এই সেই প্রতিশ্রুত দাজ্জাল।' একথা শুনে আঁ হযরত (সা.) নীরব ছিলেন, মোটেই এবিষয়টি অস্বীকার করেন নি। আর স্পষ্টতই শপথ নেওয়ার সময় নবী (সা.)এর নীরব হয়ে থাকা তাঁর নিজের শপথ নেওয়ার নামান্তর। এছাড়াও ইবনে উমর (রা.) এ হাদীসে স্পষ্ট শব্দে লেখা আছে যে, তিনি শপথ নিয়ে বলেছেন যে ইবনে সিয়াদ-ই সেই প্রতিশ্রুত দাজ্জাল আর জাবেরও শপথ করে বলেছিলেন, প্রতিশ্রুত দাজ্জাল হল ইবনে সিয়াদ, আর আঁ হযরত (সা.) নিজেও বলেছেন যে, 'আমি নিজের উম্মতের জন্য ইবনে সিয়াদের দাজ্জাল হওয়ার বিষয়ে শঙ্কিত। এছাড়াও মুসলিমে আরও একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সাহাবাগণ এ বিষয়ে ঐক্যমত ছিলেন যে, ইবনে সিয়াদই হল প্রতিশ্রুত দাজ্জাল। কিন্তু মুসলিমে বিদ্যমান ফাতেমার হাদীসের সঙ্গে তামীমদারীর হাদীসের সরাসরি সংঘাত রয়েছে। এখন আমরা এই দুই দাজ্জালের মধ্যে কাকে দাজ্জাল মনে করব?"

(আল হক মুবাহাসা লুধিয়ানা, রুহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ১১)

জুমআর খুতবা

মহানবী (সা.) হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর জন্য দোয়া করেন যে, اَللّٰهُمَّ احْفَظْ اَبَا اَيُّوْبَ كَمَا بَاتَ يَحْفَظُنِيْ (আল্লাহুম্মাহ্ফেয আবা আইয়ুবা কামা বাতা ইয়াহ্ফাযনী)। অর্থাৎ হে আল্লাহ্ ! তুমি আবু আইয়ুবের ঠিক সেভাবেই নিরাপত্তা বিধান করো যেভাবে সে আমার নিরাপত্তা বিধানের জন্য সারারাত জেগে কাটিয়েছেন।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান বদরী সাহাবা হযরত অউফ বিন হারিস বিন রিফাআ আনসারী এবং হযরত খালিদ (আবু আইয়ুব) আনসারি রাজিআল্লাহু তা'লা আনহুমার পবিত্র জীবনালেখ্য।

আমার উম্মত ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের মাঝে থাকবে অথবা বলেন ফিতরতের ওপর (তথা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায়) প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতদিন পর্যন্ত তারা মাগরিবের নামাযে বিলম্ব করবে না, এমনকি আকাশে তারা উদিত হবে।

চারজন মরহুমীনের স্মৃতিচারণ এবং জানাযা গায়েব, যারা হলেন- আব্দুল হাই মণ্ডল সাহেব মুয়াল্লিম (ভারত), মাননীয় সিরাজুল ইসলাম সাহেব মুয়াল্লিম, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ (ভারত), হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দৌহিত্র মাননীয় শাহিদ আহমদ খান পাশা সাহেব এবং মাননীয় সৈয়্যদ মাসুদ শাহ সাহব, শিফিল্ড (যুক্তরাজ্য) ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ২০ নভেম্বর , ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (২০ নবুয়্যত, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজ প্রথমে যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত অওফ বিন হারেস বিন রিফা' আনসারী (রা.)। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে তার নাম অওফ বিন আফরা, অওফ বিন হারেস এবং অওয বিন আফরাও বর্ণিত হয়েছে। আফরা ছিল তার মায়ের নাম। তিনি আনসারদের বনু নাজ্জার গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। হযরত মুআয এবং হযরত মুআওয়েয ছিলেন হযরত অওফ (রা.)-এর ভাই। হযরত অওফ (রা.) আনসারদের সেই ছয়জনের অন্যতম ছিলেন যারা সর্বপ্রথম মক্কায় এসে বয়আত করেন। তিনি আকাবার বয়আতেও অংশ নিয়েছেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পর হযরত আসাদ বিন যুরারাহ্ এবং হযরত আম্মারাহ্ বিন হাযম (রা.)-এর সাথে একত্রে বনু মালেক বিন নাজ্জার-এর প্রতিমা ভেঙেছিলেন। বদরের যুদ্ধের দিন যুদ্ধ চলাকালে হযরত অওফ বিন আফরা মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, হে আল্লাহ্ র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দার কোন্ কাজে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হন? উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন, যুদ্ধরত অবস্থায় বর্ম না থাকা সত্ত্বেও যদি নির্ভীকভাবে কেউ যুদ্ধ করতে থাকে- এমন কাজে (আল্লাহ্ আনন্দিত হন)। অর্থাৎ রণাঙ্গনে ভয়মুক্ত থাকা উচিত। একথা শুনে, হযরত অওফ বিন আফরা তার বর্ম খুলে ফেলে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন এবং এক পর্যায়ে শাহাদত বরণ করেন। বদরের যুদ্ধে আবু জাহল অওফ বিন হারেস এবং তার সহোদর হযরত মুআওয়েযকে শহীদ করেছিল। হাদীস এবং সীরাতের গ্রন্থাবলীতে বদরের যুদ্ধে আবু জাহলের ওপর আক্রমণকারী যেসব সাহাবীর নাম পাওয়া তাদের মধ্যে হযরত অওফ বিন আফরা (রা.)-এর নামও রয়েছে, পূর্বেও একবার এর উল্লেখ করেছি। সুনান আবু দাউদ এ বর্ণিত হয়েছে যে, তার নাম ছিল অওফ বিন হারেস।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ:৩৭০, ৩৭৩-৩৭৫) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৪-৬১৫) (আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২২৫-১২২৬) (সহী বুখারী, কিতাবু ফারযিল খামস, হাদীস-৩১৪১) (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-২৬৮০)

সচরাচর তার এই দু টি নামেরই উল্লেখ পাওয়া যায়। যাহোক, তিনিও আবু জাহলের হন্তারকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আর তিনি বদরের (যুদ্ধে) শহীদ হন।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর নাম হযরত খালেদ এবং তার পিতার নাম ছিল যায়েদ বিন কুলায়েব।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২২)

তিনি তার নাম ও ডাকনাম দুটোতেই সুপরিচিত। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু নাজ্জার শাখার সদস্য ছিলেন। তিনি আকাবার দ্বিতীয় বয়আতের সময় সত্তরজন আনসারীর সাথে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর মায়ের নাম ছিল হিন্দ বিনতে সাঈদ, যদিও অপর ভাষ্যমতে তার নাম ছিল যাহরা বিনতে সা'দ। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর স্ত্রীর নাম ছিল হযরত উম্মে হাসান বিনতে যায়েদ। তার গর্ভে এক পুত্র আব্দুর রহমান জন্ম গ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) এবং হযরত মুসআব বিন উমায়ের (রা.)-র মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন রচনা করেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৬৮-৩৬৯) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০০)

মহানবী (সা.) যখন হিজরত করে মদিনায় আসেন তখন মসজিদে নববী এবং তাঁর ঘর নির্মাণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করেন।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ:২৩)

মহানবী (সা.)-এর তার ঘরে অবস্থানের ঘটনাটিকে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, "বনু নাজ্জার গোত্রে পৌঁছার পর এই প্রশ্ন ওঠে যে, তিনি (সা.) কার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করবেন। গোত্রের প্রত্যেকেই এই গৌরব লাভের আকাঙ্ক্ষী ছিল, বরং অনেকে তো ভালোবাসার আতিশয্যে তাঁর উটের লাগামও হাতে নিয়ে নিচ্ছিল। এই অবস্থা দেখে মহানবী (সা.) বলেন, আমার উষ্ট্রীকে ছেড়ে দাও, এটি এখন আদিষ্ট, অর্থাৎ খোদা তা'লা যেখানে চাইবেন সেখানে এটি নিজেই বসে পড়বে, একথা বলে তিনিও সেটির লাগাম আলগা করে দেন। উষ্ট্রী সম্মুখে অগ্রসর হয় আর ধীরে ধীরে কিছুদূর হেঁটে সেখানে বসে পড়ে যেখানে পরবর্তীতে মসজিদে নববী এবং মহনবী (সা.) এর ঘর নির্মিত হয় এবং যা ছিল মদিনার দুই বালকের পরিত্যক্ত সম্পত্তি। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ওঠে পড়ে এবং সম্মুখ পানে অগ্রসর হতে থাকে। কয়েক পা এগিয়ে পুনরায় ফিরে আসে এবং যেখানে পূর্বে বসেছিল সেখানেই এসে বসে পড়ে। মহানবী (সা.) বলেন, هٰذَا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ الْمَنْزِلُ (হাযা ইনশাআল্লাহুল মানযিল) অর্থাৎ,মনে হয় আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এটিই আমাদের অবস্থানস্থল। এরপর আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করে তিনি (সা.) উষ্ট্রী থেকে নেমে পড়েন এবং জিজ্ঞেস করেন,

মুসলমানদের মাঝে এই জায়গার নিকটবর্তী ঘর কার? আবু আইয়ুব আনসারী দ্রুত সামনে আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূ ল (সা.)! আমার ঘর সবচেয়ে কাছে আর এই হলো, আমার বাড়ির দরজা, আপনি চলু ন। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে যাও আর আমাদের থাকার জায়গা প্রস্তুত কর।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী তাৎক্ষণিকভাবে নিজের ঘর গুছিয়ে ফিরে আসেন এবং মহানবী (সা.) তার সাথে ঘরের ভিতরে যান। এই বাড়িটি ছিল দ্বিতল বিশিষ্ট। আবু আইয়ু ব (রা.)-এর বাসনা ছিল মহানবী (সা.) ওপরের তলায় অবস্থান করবেন, কিন্তু মহানবী (সা.) সাক্ষাৎ-প্রত্যাশীদের সুবিধার কথা চিন্তা করে নীচতলায় থাকা পছন্দ করেন এবং সেখানেই অবস্থান করেন। রাত হলে আবু আইয়ুব আনসারী এবং তার স্ত্রী-র সারারাত এই চিন্তায় ঘুম আসেনি যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের নীচে আর আমরা তাঁর উপরে অবস্থান করছি। উপরন্তু ঘটনাক্রমে রাতের বেলায় ছাদে পানির একটি পাত্র ভেঙে যায় এবং পানির কোন ফোটা যেন নীচ তলায় না পড়ে সেজন্য আবু আইয়ুব (রা.) দ্রুত তার লেপ পানিতে ফেলে পানি শুষে নেন। প্রভাতে তারা মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে জোর অনুনয় বিনয়ের সাথে মহানবী (সা.)-কে ওপরের তলায় অবস্থানের আবেদন জানান। তিনি (সা.) প্রথমে কিছুটা সংকোচ বোধ করেন, কিন্তু পরবর্তীতে আবু আইয়ুব আনসারীর পীড়াপীড়িতে তিনি (সা.) সম্মত হন। এই ঘরে তিনি (সা.) সাত মাস অথবা ইবনে ইসহাকের বর্ণনামতে দ্বিতীয় হিজরীর সফর মাস পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। বস্তুত মসজিদে নববী এবং তার পার্শ্ববর্তী কক্ষগুলো তৈরী না হওয়া পর্যন্ত তিনি (সা.) এখানে অর্থাৎ হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর বাড়িতেই অবস্থান করেন। হযরত আবু আইয়ুব (রা.) মহানবী (সা.)-এর কাছে খাবার পাঠাতেন আর বেঁচে যাওয়া খাবার তিনি নিজে আহার করতেন আর ভালোবাসা ও আন্তরিকতার কারণে সে স্থানেই নিজের আঙুল রাখতেন যেখান থেকে রসূলে করীম (সা.) খেতেন। সচরাচর অন্যান্য সাহাবীগণও মহানবী (সা.)-এর জন্য খাবার প্রেরণ করতেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ২৬৭-২৬৮)

এই ঘটনাটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও বর্ণনা করেছেন। কিছু বাক্য বা কিছু কথা নতুন, তাই আমি এটিও সম্পূর্ণ পড়ে দিচ্ছি। মোটের ওপর সেই ঘটনাই বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর বর্ণনার একটি নিজস্ব ধরন রয়েছে। তিনি (রা.) লিখেন-

"তিনি (সা.) যখন মদিনায় প্রবেশ করেন তখন প্রত্যেকেরই বাসনা ছিল তিনি (সা.) যেন তার ঘরে অবস্থান করেন। যে যে গলি দিয়ে মহানবী (সা.)-এর উষ্ট্রী হেঁটে যেতো, সেই গলির বাসিন্দারা নিজ নিজ বাড়ির সামনে দঁ াড়িয়ে মহানবী (সা.)-কে অভ্যর্থনা জানাত এবং নিবেদন করত যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই হচ্ছে আমাদের ঘর, এই হচ্ছে আমাদের সম্পদ আর এই হচ্ছে আমাদের পরিবার-পরিজন, এসবই আপনার সেবার জন্য প্রস্তুত। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা আপনাকে নিরাপত্তা দেওয়ার সামর্থ্য রাখি, আপনি আমাদের ঘরে অবস্থান করুন। কিছু লোক আবেগের আতিশয্যে এগিয়ে এসে মহানবী (সা.)-এর উটের লাগাম ধরে ফেলত যেন মহানবী (সা.)-কে নিজ বাড়িতে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু তিনি (সা.) প্রত্যেককে এই উত্তরই দিতেন যে, আমার উষ্ট্রীকে ছেড়ে দাও, আজ এটি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আদিষ্ট; খোদা তা'লা যেখানে চাইবেন এটি সেখানেই দাঁড়াবে। অবশেষে মদিনার এক প্রান্তে বনু নাজ্জার গোত্রের এতীমদের এক ভূখণ্ডের পাশে গিয়ে উষ্ট্রী দঁ াড়িয়ে যায়। তিনি (সা.) বলেন, মনে হয় খোদা তা'লার ইচ্ছা এটাই যে, আমরা যেন এখানে অবস্থান করি। এরপর তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, এই জমি কার? এই জমিটি কতিপয় এতিমের ছিল, তাদের অভিভাবক সামনে এগিয়ে আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্ র রসূল (সা.)! এটি অমুক অমুক এতিমের জমি এবং আপনার সেবায় নিবেদিত। তিনি (সা.) বলেন, আমরা কারো সম্পদ বিনামূল্যে নিতে পারি না। অবশেষে এ জমির মূল্য নির্ধারণ করা হয় আর তিনি (সা.) সেখানে মসজিদ ও নিজের ঘর নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, সবচেয়ে নিকটতম বাড়ি কার? হযরত আবু আইয়ুব আনসারী সামনে এগিয়ে আসেন এব ং বলেন, হে আল্লাহ্ র রসূল (সা.)! আমার ঘর সবচেয়ে সন্নিকটে আর আপনার সেবায় উপস্থিত। তিনি (সা.) বলেন, ঘরে গিয়ে আমাদের জন্য কোন একটি কক্ষ প্রস্তুত কর। হযরত আবু আইয়ুব (রা.)-এর বাড়ি দ্বিতল বিশিষ্ট ছিল। তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্য ওপরতলা নির্ধারণ করেন, কিন্তু মহানবী (সা.) সাক্ষাৎকারীদের কষ্ট হবে ভেবে নীচতলা পছন্দ করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, মহানবী (সা.)-এর প্রতি আনসারদের যে সুগভীর ভালোবাসা সৃষ্টি হয়েছিল তার বহিঃপ্রকাশ উক্ত ঘটনার সময়ও পরিলক্ষিত হয়। মহানবী (সা.)-এর জোর দেওয়ায় হযরত আবু আইয়ুব (রা.) মেনে নিয়েছেন যে, তিনি (সা.) নীচতলাতেই থাকবেন,কিন্তু মহানবী (সা.) তাদের নীচে শুয়ে আছেন আর তারা ছাদের ওপর শুবেন- এই অশিষ্টাচার কীভাবে বৈধ হতে পারে, একথা ভেবে তারা স্বামী-স্ত্রী সারারাত জেগে থাকেন। এটি ছিল ভালোবাসার এক বহিঃপ্রকাশ। রাতে পানির একটি পাত্র পড়ে যায়, পানি ছাদ চুঁয়ে নীচে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় তিনি দৌড়ে গিয়ে নিজ কম্বল বা লেপ সেই পানিতে ফেলে পানি শুকিয়ে নেন। সকালে তিনি মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন আর পুরো বৃত্তান্ত তুলে ধরেন, এতে মহানবী (সা.) ওপর তলায় যেতে সম্মত হন। হযরত আবু আইয়ুব প্রতিদিন খাবার প্রস্তুত করে তাঁর (সা.) কাছে পাঠাতেন। অতঃপর মহানবী (সা.)-এর নিকট থেকে বেঁচে যাওয়া যে খাবার আসত, তা থেকে হযরত আবু আইয়ুবের পুরো পরিবার খেত। কিছুদিন পর অন্যান্য আনসাররাও আতিথেয়তায় অংশগ্রহণের ওপর জোর দেন। মহানবী (সা.)-এর নিজ ঘরের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত পালাক্রমে মদিনার মুসলমানরা তার ঘরে খাবার সরবরাহ করতে থাকে।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন,আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২২৮-২২৯)

হযরত আবু আইয়ুব (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তার ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি (সা.) নীচতলায় অবস্থান করেন আর হযরত আবু আইয়ুব ওপরতলায় ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এক রাতে হযরত আবু আইয়ুব (রা.) ঘুমে থেকে জেগে ওঠে বলেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর মাথার ওপর হাঁটাচলা করছি! একথা বলে তিনি একদিকে সরে যান আর এক কোণে রাত কাটান। এরপর তিনি মহানবী (সা.)-এর সকাশে গিয়ে নিবেদন করলে তিনি (সা.) বলেন, নীচের তলায় সুবিধা বেশি। তিনি (রা.) বলেন, আমি এমন ছাদে থাকতে পারব না যার নীচে আপনি রয়েছেন। অতঃপর তিনি (সা.) ওপরতলায় স্থানান্তরিত হয়ে যান আর আবু আইয়ুব (রা.) নীচে চলে আসেন। তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর জন্য খাবার প্রস্তুত করতেন। মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে যখন সেই খাবারের কিছু অংশ ফেরত নিয়ে আসা হতো তখন যে ব্যক্তি খাবার নিয়ে আসত তিনি তাকে জিজ্ঞেস করতেন, কোন কোন স্থানে তাঁর (সা.) আঙুল লেগেছিল? অতঃপর তিনি মহানবী (সা.)-এর আঙুলের স্পর্শ লেগেছে এমন স্থানগুলো খুঁজতেন, অর্থাৎ সেসব স্থান থেকে আহার করতেন যে স্থানগুলো থেকে মহানবী (সা.) আহার করেছিলেন। তিনি একবার মহানবী (সা.)-এর জন্য খাবার প্রস্তুত করেন যাতে রসুন ছিল। সেই খাবার যখন তার কাছে ফিরিয়ে আনা হয় তখন তিনি মহানবী (সা.)-এর আঙুলের স্পর্শ কোন্ কোন্ স্থানে লেগেছে- সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তাকে যখন বলা হয় যে, মহানবী (সা.) আজ খাবার খান নি তখন তিনি শঙ্কিত হন এবং ওপরের তলায় মহানবী (সা.)-এর সমীপে গিয়ে নিবেদন করেন যে, রসুন কি হারাম? মহানবী (সা.) বলেন, না; কিন্তু আমি এটি (খাওয়া) পছন্দ করি না। একথা শুনে আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) বলেন, আপনি যা অপছন্দ করেন আমিও তা অপছন্দ করি, অথবা তিনি বলেন, আপনি যা অপছন্দ করেছেন আমিও তা অপছন্দ করছি। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.)-এর কাছে ফেরেশতা আসত, অর্থাৎ ওহী হতো এবং ফেরেশতা আসত, তাই মহানবী (সা.) দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস পছন্দ করতেন না; কিন্তু এটি হারাম নয়।

এই রেওয়ায়েতটি মুসলিম শরীফে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে খাবার পরিবেশন করা হলে তিনি সেখান থেকে খেতেন এবং তাঁর উদ্বৃত্ত খাবার আমার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। একদিন তিনি (সা.) নিজের খাবার পাঠিয়ে দেন, কিন্তু সেখান থেকে তিনি খাবার খান নি; কেননা তাতে রসুন ছিল। আমি মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করি, এটি কি হারাম? তিনি (সা.) উত্তরে বলেন, না; কিন্তু আমি এর গন্ধের জন্য এটি অপছন্দ করি। একথা শুনে তিনি অর্থাৎ আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) নিবেদন করেন, আপনি যা অপছন্দ করেন আমিও তা অপছন্দ করি।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল আশরিবা, হাদীস: ৫৩৫৬-৫৩৫৮)

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল-এর আরেকটি রেওয়ায়েতে এ ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) বর্ণনা

করেন, মহানবী (সা.) আমাদের বাড়ির নীচতলায় থাকা আরম্ভ করেন আর আমি ছিলাম ওপরের তলায়। একবার ওপর তলায় পানি পড়ে গেলে আমি এবং উম্মে আইয়ুব একটি চাদর নিয়ে এই ভয়ে পানি শুকাতে আরম্ভ করি যে, কোথাও আবার সেই পানি চুঁয়ে মহানবী (সা.)-এর ওপর না পড়ে। এরপর আমি ভয়ে ভয়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদের জন্য সঙ্গত নয় যে, আমরা আপনার ওপরে থাকব। তাই আপনি ওপরের তলায় অবস্থান করুন। কাজেই মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে তাঁর জিনিসপত্র ওপরের তলায় স্থানান্তরিত করা হয়। মহানবী (সা.)-এর (ঘরের) জিনিসপত্র খুবই সামান্য ছিল। এরপর আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি যখন আমাকে খাবার পাঠান তখন আমি তা পরখ করি আর যেখানে আপনার আঙুলের চিহ্ন দেখি সেখানেই আমি আমার হাত রাখি, কিন্তু আজ আপনি আমাকে যে খাবার পাঠিয়েছেন, আমি তাতে আপনার আঙুলের ছাপ দেখতে পাই নি। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, একথা ঠিক, আসলে এতে পেয়াজ ছিল। এখানে রসুনের পরিবর্তে পেয়াজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমার কাছে যে ফেরেশতা আসে- তার কারণে আমি এটি খেতে অপছন্দ করি; কিন্তু তোমরা তা খাও। (মুসানাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৭৮১)

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে বদর, উহুদ, পরিখাসহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৬৯)

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন, বদরের যুদ্ধের দিন আমরা সারিবদ্ধ হলে আমাদের কিছু লোক (সারি থেকে) সামনে এগিয়ে যায়। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, আমার সাথে, আমার সাথে। (মুসানাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৭৮০) অর্থাৎ আমার পিছনে থাক এবং আমার সামনে যেও না।

হযরত সাফিয়া (রা.)-এর বাসর রাতের উল্লেখ রয়েছে, যদিও এটি আমি ইতিপূর্বেই কারো স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে উল্লেখ করেছিলাম, তথাপি পুনরায় বর্ণনা করছি। হযরত সাফিয়া (রা.) যে রাতে মহানবী (সা.)-এর ঘরে আসেন সেই রাতে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী মহানবী (সা.)-এর তাঁবুর বাইরে নগ্ন তরবারি হাতে সারারাত জেগে প্রহরা দিতে থাকেন এবং তাঁবুর চতুষ্পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করতে থাকেন। সকালে যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁবুর বাইরে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-কে দেখেন তখন মহানবী (সা.) তাকে বলেন, হে আবু আইয়ুব! কী ব্যাপার? তিনি (রা.) উত্তরে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এ মহিলার প্রেক্ষাপটে আপনার নিরাপত্তার বিষয়ে আমি শঙ্কিত ছিলাম, কেননা তার পিতা, স্বামী এবং তার জাতির লোকেরা নিহত হয়েছে আর তিনি কুফরি থেকে সবেমাত্র বেরিয়েছেন। তাই আপনার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে আমি সারা রাত প্রহরা দিচ্ছিলাম। একথা শুনে মহানবী (সা.) হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর জন্য দোয়া করেন যে, اَللّٰهُمَّ احْفَظْ اَبَا اَيُّوْبَ كَمَا بَاتَ يَحْفَظُنِيْ (আল্লাহুম্মাহ্‌ফেয আবা আইয়ুবা কামা বাতা ইয়াহ্‌ফাযনী)। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি আবু আইয়ুবের ঠিক সেভাবেই নিরাপত্তা বিধান করো যেভাবে সে আমার নিরাপত্তা বিধানের জন্য সারারাত জেগে কাটিয়েছেন। ইমাম সোহেলি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর এই দোয়া অনুসারে হযরত আবু আইয়ুবের নিরাপত্তা বিধান করেন। এমনকি রোমানরাও তার কবরের সুরক্ষায় নিয়োজিত ছিল এবং তারা যখন তার নামের দোহাই দিয়ে বৃষ্টি যাচনা করত তখন তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হতো।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৫)

হযরত মাহমুদ বলেন, আমি হযরত ইতবান বিন মালেক আনসারী (রা.)-এর নিকট শুনেছি, আর তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা বদরের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে অংশ নিয়েছিলেন, তিনি বলতেন, আমি আমার জাতি বনু সালেম -এর নামাযের ইমামতি করতাম। আমার ও তাদের পাড়ার মাঝে একটি নর্দমা ছিল। বৃষ্টি হলে পানি পেরিয়ে তাদের মসজিদে যাওয়া আমার জন্য কষ্টকর হতো। এজন্য আমি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করি যে, আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। আমার বাড়ি ও আমার গোত্রের লোকদের বসতিস্থলের মাঝে যে নর্দমা রয়েছে বৃষ্টি হলে তা উপচে পড়ে আর আমার জন্য এটি পার করা কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। তাই আমার বাসনা হলো আপনি আমার ঘরে আসুন আর এমন জায়গায় নামায পড়ুন যেটিকে আমি নামাযের স্থান হিসেবে অবলম্বন করব। মহানবী (সা.) বলেন, আমি আসব। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) পূর্বাহ্নে আমার বাড়িতে আসেন আর তিনি (সা.) ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে আমি অনুমতি প্রদান করি। তিনি (সা.) আসন গ্রহণের পূর্বেই বলেন, তুমি তোমার ঘরের কোন্ স্থানটি আমার নামায পড়ার জন্য পছন্দ কর? অর্থাৎ মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি আমাকে নামায পড়ার জন্য আসতে বলেছিলে, কোন্ স্থানটিতে নামায পড়ব? আমি ইঙ্গিতে মহানবী (সা.)-কে সেই স্থানটি দেখাই যেখানে আমি চাচ্ছিলাম যেন তিনি নামায পড়েন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) দাঁড়িয়ে যান এবং তকবীর দেন আর আমরাও তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। তিনি (সা.) দুই রাকাত নামায পড়ার পর সালাম ফেরান আর তিনি সালাম ফিরালে আমরাও সালাম ফিরাই। তখন আমি তাকে 'খাযিরা' অর্থাৎ মাংস ও আটা দিয়ে প্রস্তুতকৃত এক ধরনের খাবার খাওয়ার জন্য বসতে বলি যা তাঁর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ইতোমধ্যে পাড়ার লোকেরা জেনে যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার বাড়িতে অবস্থান করছেন। তখন তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক ছুটে আসে, যার ফলে বাড়িতে ব্যপক জনসমাগম হয়। তাদের মাঝ থেকে এক ব্যক্তি বলে, মালিক কোথায়, আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না? তখন কেউ বলে উঠে, সে মুনাফিক। অর্থাৎ অন্য এক সাহাবী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, সে কোথায়? তাকে বলা হয়, সে তো মুনাফিক। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি তার ভালোবাসা নেই, তাই সে আসে নি। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, এমনটি বলো না। তোমরা কি জান না যে, সে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্)-এর স্বীকারোক্তি দিয়েছে আর সে এই স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি চায়! তিনি বলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) সবচেয়ে ভালো জানেন, কিন্তু খোদার কসম! আমরা তো তার বন্ধুত্ব এবং তার উঠাবসা মুনাফিকদের সাথেই দেখি। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য আগুন হারাম করে দিয়েছেন যে ব্যক্তি খোদার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্)-এর স্বীকারোক্তি দিয়েছে। হযরত মাহমুদ বিন রবী বলতেন, এ কথাটি আমি আরো কয়েকজন লোকের কাছে বর্ণনা করি যাদের মাঝে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহাবী হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)ও ছিলেন। তিনি সেই যুদ্ধে ছিলেন যে যুদ্ধে তিনি রোমানদের এলাকায় মৃত্যু বরণ করেন আর তাদের নেতা ছিল মুআবিয়ার পুত্র ইয়াযীদ। হযরত আবু আইয়ুব (রা.) আমার কথা অস্বীকার করেন এবং বলেন, খোদার কসম! আমি মনে করি না রসূলুল্লাহ্ (সা.) কখনো এমন বলে থাকবেন যা তুমি বলছ; অর্থাৎ আগুন তার জন্য হারাম যে শুধু لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) বলবে। যাহোক তিনি বলেন, এ বিষয়টি আমার জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক ছিল। আমি এটি নিয়ে খুবই চিন্তিত ছিলাম। কাজেই আমি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য এই সংকল্প করলাম যে, যদি আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ভালো রাখেন এবং এ যুদ্ধ শেষে ফিরে যেতে পারি তাহলে এ কথাটি আমি হযরত ইতবান বিন মালেক (রা.)-কে তার জাতির মসজিদে জীবিত পেলে অবশ্যই জিজ্ঞেস করব। অতএব আমি (যুদ্ধ থেকে) ফিরে আসি এবং হজ্জ বা উমরা'র জন্য ইহরাম বাঁধি। এরপর যাত্রা করে আমি মদিনায় আসি এবং বনু সালেমের পাড়ায় গিয়ে আমি দেখতে পাই, হযরত ইতবান বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন এবং তাঁর দৃষ্টিশক্তি অপস্রিয়মান আর তিনি পাড়ার লোকদের ইমামতি করছিলেন। নামায শেষে সালাম ফিরানোর পর আমি তাকে সালাম দিয়ে আমার পরিচয় দিই। এরপর আমি তাকে সেই বিষয়টি জিজ্ঞেস করলে তিনি এটিকে সেভাবেই বর্ণনা করেন, যেভাবে প্রথমবার আমাকে বলেছিলেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুত তাহাজ্জদ, রেওয়াত নং-১১৮৬)

অর্থাৎ একথা সঠিক যে, আমি স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) পড়েছে তার জন্য আগুন হারাম হয়ে গেছে। কিন্তু হযরত আবু আইয়ুব এটি মানতেন না। এ বিষয়ে নিজের অভিমত লিখতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَبْتَغِيْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ (মান ক্বালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ইয়াবতাগী বেযালিকা ওয়াজহাল্লাহে)।

ইমাম মাহদীর বাণী

স্মরণ রাখিও যে, মুক্তি সেই জিনিষের নাম নহে যাহা মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হইবে, বরং প্রকৃত মুক্তি ইহাই যাহা এই দুনিয়াতেই স্বীয় জ্যোতিঃ প্রদর্শন করিয়া থাকে।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৮)

দোয়াপ্রার্থী : Nur Jahan Begum, Kolkata (W.B)

প্রথমে এই হাদীসের অনুবাদ পড়ে দিচ্ছি, এতে করে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ হযরত মাহমুদ বিন রবী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত ইতবান বিন মালেক (রা.)-এর কাছে শুনেছি যে, মহানবী (সা.) বলতেন, আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক সেই ব্যক্তির জন্য অগ্নি হারাম করে দিয়েছেন যে পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির খাতিরে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্)-এর স্বীকারোক্তি প্রদান করে। কিন্তু আমি যখন এমন একটি বৈঠকে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করি যেখানে সাহাবী হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) উপস্থিত ছিলেন, তখন তিনি (রা.) এই রেওয়ায়েতটি অস্বীকার করে বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি এটি ভাবতেই পারি না যে, মহানবী (সা.) এমনটি বলে থাকবেন। তিনি আরো লিখেন, হাদীস বর্ণনার রীতি অনুসারে সহীহ্ ছিল (অর্থাৎ হাদীস বর্ণনার যে রীতি রয়েছে সে অনুসারে এটি সহীহ্ ছিল), এমন একটি হাদীসকে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) নিজস্ব বিচারবুদ্ধি অনুসারে, অর্থাৎ তিনি স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে যা সঠিক মনে করতেন সেটির ওপর ভিত্তি করে, তা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। এরপর মিয়া বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, যদিও হতে পারে, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর যুক্তিপ্রমাণ সঠিক নয়, কিন্তু সর্বোপরি এ হাদীসটি এটি প্রমাণ করে, অর্থাৎ মিয়া বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এটি প্রমাণ করতে চাইছেন যে, সাহাবীরা (রা.) বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই কোন হাদীস মেনে নিতেন না বরং সেগুলো নিয়ে প্রণিধান করতেন এবং ভালোভাবে গবেষণা করতেন। তিনি লিখেন, এ হাদীসটি এটি প্রমাণ করে যে, সাহাবীরা (রা.) অন্ধের ন্যায় সব রেওয়ায়েত গ্রহণ করতেন না বরং রেওয়ায়েত ও দেরায়েত উভয় নীতির অধীনে পূর্ণ বিশ্লেষণ করার পর তা গ্রহণ করতেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ১৬)

বুখারীর এই হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত সৈয়্যদ ওলীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব লিখেছেন যে, হযরত মাহমুদ বিন রবী-এর কাছ থেকে যখন তিনি অর্থাৎ আবু আইয়ুব আনসারী এই রেওয়ায়েত শুনেন তখন তিনি (তা) অস্বীকার করেন। কারো কারো ধারণামতে তার অস্বীকারের কারণ ছিল, কেবল لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্)-র অঙ্গীকার আগুন থেকে রক্ষা করতে পারে না, যতক্ষণ না তার সাথে সৎকর্ম থাকবে। এটি প্রমাণিত ইসলামী বিষয়, একান্ত সঠিক এবং এরূপই হয়ে থাকে। এরপর শাহ্ সাহেব লিখেন, কিন্তু يَبْتَغِي بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰه (ইয়াবতাগী বেযালিকা ওয়াজহাল্লাহ্) বাক্য এ কথা স্পষ্ট করছে যে, তওহীদের এই স্বীকারোক্তি কোন ধরণের। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কলেমা পাঠ করে বা لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰه (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) বলে, তার জন্য আগুন হারাম। অতঃপর শাহ্ সাহেব লিখেন, হযরত মাহমুদ এই ধারণায় দ্বিতীয়বার সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য যান যে, তিনি হয়ত কিছু শব্দ মনে রাখতে পারেন নি। আর এরপর তিনি যখন দ্বিতীয়বার তদন্ত করেন তখন পুনরায় এটিই প্রমাণিত হয় যে, রেওয়ায়েতের শব্দাবলী সঠিক ছিল। এরপর তিনি লিখেন, কারো ঈমান বা কপটতা সম্পর্কে জনসম্মুখে মত প্রকাশ করা অশোভনীয় অথবা কারো ঈমান বা কপটতা সম্পর্কে জনসাধারণের সামনে মতামত ব্যক্ত করা অনুচিত, অর্থাৎ এমনিতেই কাউকে বলে দেওয়া যে, সে মুনাফিক বা তার ঈমান দুর্বল- এটি ভ্রান্ত রীতি, কেননা মহানবী (সা.) এই উপলক্ষ্যে ইবনে দুহ্শমের সমালোচনা পছন্দ করেন নি। অর্থাৎ সর্বসাধারণের সম্মুখে এভাবে কথা বলাকে তিনি অপছন্দ করেছেন। এরূপ ছিদ্রান্বেষণ সংশোধনের পরিবর্তে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে থাকে। (সহী বুখারী, কিতাবুত তাহাজ্জুদ, হাদীস-১১৮৬)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস এবং হযরত মিসওয়ার বিন মাখরামা 'আবওয়া' নামক স্থানে গোসলের মসলা-মসায়েল সম্পর্কে মতভেদ করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস বলেন, মুহরেম (অর্থাৎ ইহরাম বেঁধেছে এমন) ব্যক্তি নিজের মাথা ধৌত করতে পারে আর হযরত মিসওয়ার বলেন, মুহরেম ব্যক্তি নিজের মাথা ধৌত করতে পারে না। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস আমাকে হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর কাছে প্রেরণ করেন। আমি তাকে দুটি কাঠের মাঝে গোসলরত অবস্থায় পাই। তার ওপর কাপড় দ্বারা পর্দা করা হয়েছিল। আমি তাকে আস্সালামু আলাইকুম বললে তিনি জানতে চান, কে? আমি বললাম, (অধম) আব্দুল্লাহ্ বিন হুনায়েন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস আমাকে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন এটি জিজ্ঞেস করার জন্য যে, ইহরাম বাঁধা অবস্থায় মহানবী (সা.) নিজের মাথা কীভাবে ধৌত করতেন, কেননা বলা হয় যে, ইহরাম বাঁধলে মাথা ধৌত করা উচিত নয়। তখন হযরত আবু আইয়ুব নিজের হাত কাপড়ের ওপর রাখেন, সেটিকে (কিছুটা) নীচে নামান, যার ফলে আমি তার মাথা দেখতে পাই। অর্থাৎ যে পর্দা টানিয়েছিলেন, সেটিকে (কিছুটা) নীচে নামিয়ে তিনি তার মাথা আমাকে দেখান। এরপর যে ব্যক্তি তার ওপর পানি ঢালছিল তাকে তিনি পানি ঢালতে বলেন। তখন সেই ব্যক্তি তার মাথায় পানি ঢালে। অতঃপর তিনি তার উভয় হাত নিজের মাথায় রাখেন, হাতদ্বয় সামনে আনেন এরপর পিছনে নিয়ে যান এবং বলেন যে, আমি মহানবী (সা.)-কে এমনটি করতে দেখেছি।

(সহী বুখারী, কিতাবু জাযাউস সাইদ, হাদীস-১৮৪০)

অর্থাৎ মাথা ধৌত করতে গিয়ে (হাত) একবার সামনে এবং এরপর পিছনে নিয়ে যান।

হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত আবু আইয়ুব আনসারী মহানবী (সা.)-এর পবিত্র শ্মশ্রুতে কোন জিনিস অর্থাৎ খড়কুটা বা কুটা জাতীয় বস্তু দেখলে তিনি সেখান থেকে তা পৃথক করে দেন এবং মহানবী (সা.) -কে দেখান। এতে মহানবী (সা.) বলেন, আবু আইয়ুব-এর জীবন থেকে আল্লাহ্ তা'লা সেই জিনিস দূর করে দিন যা তিনি অপছন্দ করেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন, হে আবু আইয়ুব! তোমার যেন কোন কষ্ট না হয়।

(কুনযুল আম্মাল, খণ্ড-১৩,পৃ: ৬১৪)

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী উষ্ট্রীর যুদ্ধ, সিফ্ফিনের যুদ্ধ এবং নাহরাওয়ানের যুদ্ধে হযরত আলীর সেনাবাহিনীর সম্মুখ সারিতে ছিলেন।

(উসদুল গাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২২)

হযরত আবু আইয়ুবআনসারীর ওপর হযরত আলীর কীরূপ বিশ্বাস ছিল তা এই বিষয়টি থেকে প্রকাশ পায় যে, হযরত আলী যখন কূফা-কে নিজের রাজধানী ঘোষণা করেন এবং সেখানে স্থানান্তরিত হন, তখন হযরত আবু আইয়ুব আনসারীকে মদিনার গভর্ণর নিযুক্ত করেন। তিনি চল্লিশ হিজরী সন পর্যন্ত মদিনার গভর্ণর ছিলেন। অবশেষে ইয়ুসর বিন আবু আরতা-র নেতৃত্বে আমীর মুআবিয়ার সিরিয়ান বাহিনী মদিনায় আক্রমণ করলে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী মদিনা ত্যাগ করে কূফায় হযরত আলীর কাছে স্থানান্তরিত হন। মহানবী (সা.)-এর (তিরোধানের) পর সাহাবীগণ খিলাফতের দরবার থেকে মাসিক ভাতা পেতেন। হযরত আবু আইয়ুব-এর ভাতা প্রথমে চার হাজার ছিল। হযরত আলী নিজ খিলাফতকালে তা কুড়ি হাজার করে দেন। পূর্বে আটজন ক্রীতদাস তার জমি চাষাবাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, হযরত আলী চল্লিশজন ক্রীতদাস করে দেন।

(তারিখুত তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৩)

হযরত হাবীব বিন আবু সাবেত থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু আইয়ুব আমীর মুআবিয়ার কাছে আসেন এবং তার কাছে নিজের ঋণগ্রস্ততার বিষয়ে অভিযোগ করেন, তখন তিনি তা দেখেন নি যা তিনি পছন্দ করতেন বরং তা দেখেছেন যা তিনি অপছন্দ করতেন। অর্থাৎ হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর পছন্দনীয় বিষয় তিনি দেখেন নি, বরং তিনি তার অপছন্দনীয় বিষয় দেখেছেন। এতে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, তুমি পরবর্তীতে অবশ্যই বিভিন্ন (অপছন্দনীয়) বিষয়ের প্রাধান্য দেখতে পাবে। আমীর মুআবিয়া বলেন, তিনি (সা.) তোমাদেরকে তখন কী (করতে) বলেছিলেন? অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন এ কথা বলেন, তখন তাঁর দিক-নির্দেশনা কী ছিল? হযরত আবু আইয়ুব বলেন, মহানবী (সা.) বলেছিলেন, (তখন) তোমরা ধৈর্য ধারণ করো। অর্থাৎ যখন অগ্রাধিকার পাল্টে যাবে, যেখানে তোমাদের কথা গ্রহণ করা হবে না এবং পছন্দনীয় কথা শোনা হবে না, তখন তোমরা ধৈর্য ধারণ কোরো। তখন আমীর মুআবিয়া বলেন, তাহলে তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। অর্থাৎ মহানবী (সা.) যেহেতু ধৈর্য ধারণের কথা বলেছেন তাই ধৈর্য ধারণ কর। হযরত আবু আইয়ুব বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমার কাছে কখনো কোন কিছু চাইব না। এরপর হযরত আবু আইয়ুব বসরায় চলে যান আর হযরত ইবনে আব্বাসের কাছে অবস্থান করেন। হযরত ইবনে আব্বাস তার জন্য নিজের ঘর ছেড়ে দেন এবং বলেন আমি অবশ্যই আপনার সাথে তেমনই

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"
(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

ব্যবহার করব যেমনটা আপনি মহানবী (সা.)-এর সাথে করেছিলেন। অর্থাৎ আপনি মহানবী (সা.)-এর যেরূপ আতিথ্য করেছিলেন আমিও আপনার ঠিক তেমনই আতিথেয়তা করব। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তার পরিবারবর্গকে আদেশ দিলে তারা বাইরে চলে যায় আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ঘরে যা কিছু আছে সবই আপনার। এছাড়া তিনি হযরত আবু আইয়ুবকে চল্লিশ হাজার দিরহাম ও কুড়ি জন ক্রীতদাস প্রদান করেন। অর্থাৎ নিজের জন্য তিনি ভিন্ন ব্যবস্থা করে নেন আর তাকে কেবল ঘরই দেন নি, বরং চল্লিশ হাজার দিরহাম এবং কুড়ি জন ক্রীতদাসও প্রদান করেন। (কুনযুল আম্মাল, খণ্ড-১৩, পৃ: ৬১৪)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) وَاَنْفِقُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَیْدِیْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ (সূরা বাকারা: ১৯৬) আয়াতের তফসীরে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্ম অনুধাবনের ক্ষেত্রে মানুষ অনেক ভুল করেছে। وَاَنْفِقُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَیْدِیْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوْا اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ " অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লার পথে কোথাও তাদের কোন কষ্ট হলে তারা তাৎক্ষণিকভাবে বলে বসে, এটি তো নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার মতো বিষয়, কেননা আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন وَلَا تُلْقُوْا بِاَیْدِیْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ অর্থাৎ নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না, তাই আমরা এতে কীভাবে অংশ নিতে পারি ? অথচ এর অর্থ কখনোই এটি নয় যে, যেখানে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে সেখান থেকে মুসলমানদের পলায়ন করা উচিত এবং তাদের কাপুরুষতা প্রদর্শন করা উচিত, বরং এর অর্থ হলো এই যে, যখন শত্রুর সাথে যুদ্ধ হয় তখন নিজেদের ধনসম্পদ অধিক হারে খরচ কর। যদি তোমরা নিজেদের ধনসম্পদ খরচে কার্পণ্য কর তাহলে নিজ হাতে নিজের মৃত্যুর উপকরণ সৃষ্টি করবে। যেমন, হাদীসে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি যখন কস্তুনতুনিয়া (বর্তমান ইস্তাম্বুল) জয়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলেন তখন বলেছিলেন যে, এই আয়াত আমাদের আনসারদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছিল। এরপর তিনি বলেন, পূর্বে আমরা খোদা তা'লার পথে নিজেদের ধনসম্পদ খরচ করতাম, কিন্তু খোদা তা'লা যখন তাঁর ধর্মকে শক্তি ও সম্মান দান করেন এবং মুসলমানরা বিজয় লাভ করে, তখন قُلْنَا هَلْ نُقِیْمُ فِیْ اَمْوَالِنَا وَنُصْلِحُهَا..... (কুলনা হাল নুকিমু ফি আমওয়ালিনা ওয়া নুসলিহুহা) অর্থাৎ, আমরা বললাম, এখন যদি আমরা নিজেদের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করি এবং সেটিকে জমা করতে থাকি তাহলে তা উত্তম হবে। সেই সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, আল্লাহ্ তা'লার পথে স্বীয় সম্পদ ব্যয় করতে দ্বিধা করো না, কেননা তোমরা যদি এরূপ কর তাহলে এর অর্থ হবে তোমরা নিজেদের প্রাণকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে চাও। অতএব, নিজেদের সম্পদ জমা করো না, বরং তা আল্লাহ্ তা'লার পথে বেশি বেশি ব্যয় কর, নতুবা তোমাদের প্রাণ বিনষ্ট হবে। শত্রুরা তোমাদের ওপর চড়াও হবে এবং এর ফলে তোমরা ধ্বংস হবে।

(তফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪২৯)

হযরত আলীর পর আমীর মুআবিয়ার শাসনকালে উক্ববা বিন আমের জুহানী তার পক্ষ থেকে মিশরের গভর্ণর ছিলেন। হযরত উক্ববার এমারতকালে হযরত আবু আইয়ুব দু'বার মিশর সফরে যান। প্রথম সফর হাদীস অন্বেষণের জন্য ছিল। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, হযরত উক্ববা কোন বিশেষ হাদীস বর্ণনা করেন। শুধুমাত্র একটি হাদীসের জন্য হযরত আবু আইয়ুব বৃদ্ধ বয়সে সফরের কষ্ট সহ্য করেন। দ্বিতীয়বার রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি মিশরে গমন করেন।

(সীয়ারুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১৩)

মারওয়ান যখন মদিনার গভর্ণর ছিলেন তখন তিনি একদিন এসে দেখেন যে, এক ব্যক্তি তার মুখমণ্ডল মহানবী (সা.)-এর কবরে ঠেকিয়ে রেখেছে। মারওয়ান বলেন, তুমি কি জান যে, তুমি কী করছ? ঝুঁকে সিজদা করছ- এটিতো শির্ক। এরপর মারওয়ান ঐ ব্যক্তির কাছে গিয়ে দেখেন যে, তিনি হযরত আবু আইয়ুব আনসারী। তিনি উত্তর দেন যে, হ্যাঁ, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে এসেছি, এই পাথরগুলোর কাছে আসি নি।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড,পৃ: ৭৮৫) (সীয়ারুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১৬)

এ কথার অর্থ ছিল এই যে, আমি মহানবী (সা.)-এর প্রতি প্রেম ও ভালোবাসার কারণে ঝুঁকে আছি, পাথরকে সিজদা করছি না এবং আমি কোন শির্কও করছি না, বরং এটি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ আর তাতেও আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদই আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত আছে, কোন শির্ক নয়।

আবু আব্দুর রহমান হুবলী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, আমরা সমুদ্রে ছিলাম এবং আব্দুল্লাহ্ বিন কায়েস ফাজারী আমাদের আমীর হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। আমাদের সাথে হযরত আবু আইয়ুব আনসারীও ছিলেন। তিনি গনিমতের মাল বণ্টনকারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যিনি বন্দিদের তত্ত্বাবধান করছিলেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী দেখতে পান যে, এক নারী কাঁদছে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, এই নারীর কী হয়েছে? লোকে বলে, এই নারী ও তার ছেলেকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন তিনি সেই শিশুর হাত ধরেন এবং তাকে তার মায়ের হাতে দিয়ে দেন। এরপর গনিমতের মাল বণ্টনকারী আব্দুল্লাহ্ বিন কায়েসের কাছে যান এবং তাকে সব খুলে বলেন। তখন তিনি হযরত আবু আইয়ুবকে ডেকে পাঠান এবং জিজ্ঞেস করেন, আপনি এরূপ কেন করেছেন? তখন তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি মা ও সন্তানের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায় আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামতের দিন তার ও তার প্রিয়জনদের মাঝে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করবেন।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৭৬৪)

অতএব (আজকাল যেভাবে) কতিপয় লোক মায়ের কাছ থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে নেয় তাদের জন্যও এতে শিক্ষণীয় দিক রয়েছে। এছাড়া ইসলামের ওপর আপত্তিকারীদের দেখা উচিত যে, তারা কী করে। ইসলাম তো এতদূর পর্যন্ত খেয়াল রাখে! সম্প্রতি আমেরিকা থেকেই একটি সংবাদ এসেছে যে, সেখানে যে অভিবাসীরা এসেছিল, সেই মুহাজিরদের মাঝে তারা বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে, মা ও সন্তানদের পৃথক করে দিয়েছে। এমনকি কিছুকাল পর সন্তানরা তাদের মায়েদের চিনতেও পারে নি। যাই হোক, ইসলাম কত সংবেদনশীলতার সাথে নির্দেশ দেয় যে, মায়েদেরকে তাদের সন্তান থেকে পৃথক করো না এবং এ কারণে তাদেরকে কষ্ট দিও না।

হযরত মারসাদ বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী যখন জিহাদের উদ্দেশ্যে আমাদের কাছে আসেন তখন হযরত উক্ববা বিন আমের মিশরের গভর্ণর ছিলেন। তিনি মাগরিবের নামায আদায়ে কিছুটা বিলম্ব করেন। হযরত আবু আইয়ুব তার কাছে যান এবং বলেন, হে উক্ব বা! তুমি অসময়ে কিসের নামায পড়ছ? হযরত উক্ববা উত্তরে বলেন, আমরা কাজে ব্যস্ত ছিলাম। হযরত আবু আইয়ুব বলেন, আল্লাহ্র শপথ, তোমাকে আমার এ কথা বলার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, লোকেরা যেন এটি মনে না করে যে, তুমি মহানবী (সা.)-কে এরূপ করতে দেখেছ। তুমি কি মহানবী (সা.)-কে এ কথা বলতে শোন নি যে, আমার উম্মত ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের মাঝে থাকবে অথবা বলেন ফিতরতের ওপর (তথা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায়) প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতদিন পর্যন্ত তারা মাগরিবের নামাযে বিলম্ব করবে না, এমনকি আকাশে তারা উদিত হবে।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৭৭৩)

অর্থাৎ প্রথম প্রহরে মাগরিবের নামায আদায় করা আবশ্যক।

আবু ওয়াসেল থেকে বর্ণিত, আমি আবু আইয়ুব আনসারীর সাথে সাক্ষাৎ করি। তিনি আমার সাথে করমর্দন করেন এবং লক্ষ্য করেন যে, আমার হাতের নখ অনেক বড় হয়ে গেছে। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের মাঝে কেউ কেউ উর্ধ্বলোকের খবরাখবর জানতে চায়, অথচ সে তার নখ পাখির নখের ন্যায় লম্বা রাখে। তাদের লম্বা নখের ভিতর জীবাণু ও ময়লা জমা হয়।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৭৭৫)

অর্থাৎ অনেক উচ্চাঙ্গের ও তত্ত্বজ্ঞানের কথা বল অথচ তোমাদের বাস্তবতা হলো, তোমাদের নখ লম্বা এবং সেগুলোর মাঝে ময়লা জমা হয়, তাই নখ ছোট রাখবে। এটি মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব এতটাই স্বীকৃত ছিল যে, স্বয়ং সাহাবীরা তাঁর কাছ থেকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান নিতেন। হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, বারাআ বিন আযেব, আনাস বিন

রসুলের বাণী

আঁ হযরত (সা.)বলেছেন, "মানুষ যখন তওবা করে, অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর একত্ব স্বীকার করে, তখন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল লিবাস, বাবুস সিয়াবুল বাইয)

দোয়াপ্রার্থী: Pervez Hossain, Bolpur, Dist-Birbhum

মালেক, আবু উমামা, যায়েদ বিন খালেদ জুহানী, মিক্ব দাম বিন মাহদী কারেব, জাবের বিন সামুরা, আব্দুল্লাহ্ বিন ইয়াযীদ খাতেমী প্রমুখ, যারা স্বয়ং মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে তরবিয়ত পেয়েছিলেন, তারাও হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। তাবেঈনদের মাঝে সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব, উরওয়া বিন যুবায়ের, সালেম বিন আব্দুল্লাহ্ , আতা বিন ইয়াসার, আতা বিন ইয়াযীদ লাইসি, আবু সালামা, আব্দুর রহমান বিন আবি লায়লা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তারা হযরত আবু আইয়ুবের প্রতি গভীর ভক্তি রাখতেন।

(সীয়ারুস সাহাবা,৩য় খণ্ড,পৃ: ১১৫)

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী থেকে বর্ণিত, তিনি মুআবিয়ার শাসনামলে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হন। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং রোগ কঠিন রূপ ধারণ করে। তাই নিজ সাথীদের তিনি বলেন, আমি যদি মারা যাই তাহলে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে, এরপর যখন তোমরা শত্রুর মোকাবিলায় সারিবদ্ধ হবে তখন আমাকে নিজেদের পায়ের পাশে দাফন করে দিবে। আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস শুনাচ্ছি, যা আমি মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে শুনেছি। আমার মৃত্যু সন্নিকটবর্তী না হলে আমি তা তোমাদেরকে শুনাতাম না। আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি কখনো আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা অবস্থায় মারা যায়, সে জান্নাতে প্রবেশ করে।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু আইয়ুবের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে তিনি বলেন, আমি তোমাদের কাছ থেকে এমন একটি কথা লুকিয়েছি যেটি আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে শুনেছি। তিনি (সা.) বলেন, যদি তোমরা পাপ না করতে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা এমন জাতি সৃষ্টি করতেন যারা পাপ করত, অতঃপর আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ নিজের দয়া ও ক্ষমার গুণকে এতটাই প্রিয় জ্ঞান করেন।

রাবী মুহাম্মদ বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মুসলমানদের কোন যুদ্ধে পিছিয়ে থাকেন নি, তবে হ্যাঁ, যদি অন্য কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন সেক্ষেত্রে ভিন্ন বিষয়। অর্থাৎ একই সময়ে যদি দু'টি যুদ্ধ সংঘটিত হতো সেক্ষেত্রে তিনি কোন না কোন যুদ্ধে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতেন। তিনি কেবল এক বছর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন নি কেননা সেনাপতির দায়িত্ব একজন স্বল্প বয়স্ক যুবকের স্কন্ধে অর্পণ করা হয় তাই তিনি সে বছর যুদ্ধ থেকে বিরত থাকেন। সেই বছরের কথা স্মরণ করে তিনি আক্ষেপ করে বলতেন, আমার ওপর কাকে কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হলো- এর সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমার ওপর কাকে মনিব নিযুক্ত করা হলো- তাতে আমার কী যায় আসে, আমার ওপর কাকে মনিব নিযুক্ত করা হলো-তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথার কী আছে? এ কথা তিনি তিনবার বলেন।বলা হয়ে থাকে, যে যুবকের নেতৃত্বের কথা এই রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে তিনি হলেন আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান। রাবী বর্ণনা করেন, এরপর হযরত আবু আইয়ুব (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেনাদলের আমীর ছিল মু আবিয়ার পুত্র ইয়াযীদ, সে তাঁকে দেখতে আসে আর জিজ্ঞেস করে আপনার কোন অন্তিম ইচ্ছা থাকলে বলুন। তিনি (রা.) বলেন, আমার অন্তিম ইচ্ছা হলো, যখন আমি মারা যাব, আমাকে বাহনে করে যথাসম্ভব শত্রুদের দেশের অভ্যন্তরে নিয়ে যাবে। আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে সেখানেই দাফন করে ফেরত আসবে। হযরত আবু আইয়ুব (রা.)-এর মৃত্যু হলে সে তাকে বাহনে রাখে আর যতটুকু সম্ভব ছিল শত্রুদের দেশের অভ্যন্তরে নিয়ে যায় আর তাকে দাফন করে ফিরে আসে।'

রাবী বলেন, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী বলতেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا (সূরা তওবা: ৪১) অর্থাৎ হালকা ও ভারি- উভয় অবস্থায় যুদ্ধের জন্য বের হও। আর আমি নিজেকে হালকাও অনুভব করি এবং ভারীও। একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে যে, মক্কাবাসীদের কেউ বর্ণনা করেছে যে, ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া যখন হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর কাছে আসে তখন তিনি তাকে বলেন- মানুষের কাছে আমার সালাম পৌঁছাবে। তারা যেন আমাকে নিয়ে যাত্রা করে আর যতদূর আমাকে নিয়ে যেতে পারে যেন নিয়ে যায়। তখন ইয়াযীদ মানুষকে সেসব কথা বলে যা হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) তাকে বলেছিলেন। মানুষ তার কথা মান্য করে আর তার লাশকে যতদূর নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নিয়ে যায়।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর কনস্টান্টিনোপলে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জিহাদে নিয়োজিত ছিলেন। একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, ৫২ হিজরী সনে ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া তার পিতা আমীর মুআবিয়ার খিলাফতকালে কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধ করে। একই বছর হযরত আবু আইয়ু ব আনসারী (রা)'র মৃত্যু হয়। ইয়াযীদ বিন মুআবিয়া তার (রা.) জানাযার নামায পড়ায় এবং রোমান অঞ্চল কনস্টান্টিনোপল দুর্গের পাশেই তার সমাধি অবস্থিত। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানতে পারি যে, রোমানরা তাঁর সমাধির সংরক্ষণ ও সংস্কার করে আর দুর্ভিক্ষের সময় তারা তার দোহাই দিয়ে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করে।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৭৬৮) (আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৬৯-৩৭০) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা,২য়, পৃ:২০১)

এক বর্ণনানুযায়ী, আমীর মুআবিয়ার খিলাফতকালে ইয়াযীদ বিন মুআবিয়ার নির্দেশে রোমানদের বিরুদ্ধে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) যুদ্ধ করেন এবং পঞ্চাশ হিজরী সনে, মতান্তরে একান্ন হিজরী সনে কনস্টান্টিনোপল নগরীর পাশে মৃত্যু বরণ করেন আর সেখানেই সমাধিস্থ হন। আরেকটি বর্ণনামতে, ইয়াযীদ অশ্বারোহীদের নির্দেশ দিলে তারা হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর কবরের ওপর দিয়ে অগ্রে পশ্চাতে অশ্বচালনা করে; যে কারণে তাঁর কবরের চিহ্ন মুছে যায়। অপর এক রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-কে যে রাতে দাফন করা হয় পরদিন সকালে রোমানরা মুসলমানদেরকে জিজ্ঞেস করে যে, রাতের বেলা তোমরা কী করছিলে? উত্তরে মুসলমানরা বলে, হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) আমাদের মহানবী (সা.)-এর একজন অন্যতম জ্যেষ্ঠ সাহাবী ছিলেন আর ইসলাম গ্রহণ করার দিক থেকে তিনি (রা.) সবচেয়ে প্রবীণ ছিলেন, আমরা তাকে দাফন করেছি যেমনটি তোমরা দেখেছ। আর আল্লাহ্‌র কসম! যদি (সেই) কবর খনন করা হয় তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের হাতে ক্ষমতা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আরবের মাটিতে তোমাদের এই ঘন্টা বাজবে না। মুজাহিদ বলেন, তাদের এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তারা হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) -এর কবর থেকে সামান্য পরিমাণ মাটি সরাতো আর তখনই বৃষ্টি হতো।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৬ষ্ঠখণ্ড, পৃ:২৩)

এই রেওয়ায়েত সেখানেও বিদ্যমান, কিন্তু এটি কতটুকু সঠিক তা আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) পঞ্চাশ বা একান্ন মতান্তরে বাহান্ন হিজরী সনে কনস্টান্টিনোপলের যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী শেষ কথায় বিশ্বাসী, অর্থাৎ তিনি বাহান্ন হিজরী সনে মৃত্যু বরণ করেন।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ২য়খণ্ড, পৃ: ২০১)

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর মাজার তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অবস্থিত। সমাধিটি উঁচু প্রাঙ্গনে অবস্থিত; যা একটি পিতল নির্মিত জালি-দরজা লাগিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। তুরস্কের অধিকাংশ মানুষ আত্মার প্রশান্তির জন্য সেখানে উপস্থিত হয়।

(তাবারুক্বাতে সাহাবা, তসবীরী এলবাম, সংকলন-আরসালান বিন আখতার, পৃ: ৩৫ ও ৫৩)

বদরী সাহাবীদের এই স্মৃতিচারণ এখানেই সমাপ্ত হলো, কিন্তু চার-খলীফার বৃত্তান্ত তুলে ধরব, ইনশাআল্লাহ্ । ইতিপূর্বে তাদের কয়েকজনের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হয়েছিল, এবার বিস্তারিত বর্ণনা করব। একইভাবে প্রথমদিকে কতিপয় সাহাবীর সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করা হয়েছিল; যদি তাদের বিষয়ে আরও কোন তথ্য পাওয়া যায়, তাহলে তাদের সেসব বিষয়ও বর্ণনা করব। যখন এগুলো সব সংকলন করা হবে, তখন এগুলো সেই সাহাবীদের জীবনীর সংশ্লিষ্ট অংশে যুক্ত হয়ে যাবে; আর এমন হয়ত গুটিকতক সাহাবী-ই হবেন।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করতে চাই, যারা বিগত দিনগুলোতে মৃত্যু বরণ করেছেন; আর নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযাও পড়াব। প্রথমজন হলেন ভারতের মুয়াল্লেম সিলসিলাহ্ মোকাররম আব্দুল হাই মণ্ডল সাহেব; তিনি গত ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ৫৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ।

মরহুম ১৯৯৯ সালে গবেষণার পর জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হন। ২০০৩

(শেষাংশ শেষের পাতায়..)

২০১৫ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মানী সফর

ওয়াকফে নও ছাত্রদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বিশেষ অনুষ্ঠান

কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সূরা আলাক এর প্রথম ছয় আয়াত তিলাওয়াত করা হয়। এরপর একটি হাদীস উপস্থাপিত হয়। হাদীসের পর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

'আমি মনে করি সেই সব মৌলবীরা ভ্রান্তিতে নিপতিত, যারা আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার বিরোধী। বস্তুত তারা নিজেদের দুর্বলতা ও ভুল লুকোনোর জন্য এমনটি করে থাকে। তাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণা তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে সন্দিহান ও বিভ্রান্ত করে তোলে। আর তারা এই ফতোয়া দিয়ে বসেছে যে যুক্তি ও বিজ্ঞান ইসলামের পরিপন্থী বিষয়। কেননা তারা নিজেরা দর্শনশাস্ত্রের দুর্বলতা প্রকাশ করতে অপারগ। তাই নিজেদের দুর্বলতা আড়াল করতে তারা এই উপায় বের করেছে যে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চাই বৈধ নয়।"

অনুষ্ঠানের পর হুযুর আনোয়ার ছাত্রদেরকে প্রশ্ন করার অনুমতি দেন।

এক ছাত্র প্রশ্ন করে যে, যেমনটি হুযুর আনোয়ার প্রত্যেক খুতবায় বলে থাকেন যে, প্রত্যেক আহমদীকে জামাতের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন এবং অনুরাগের সম্পর্ক তৈরী করা উচিত। এ প্রসঙ্গে আমার প্রশ্ন হল, একজন আহমদী ছাত্র কিভাবে জামাতের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক দৃঢ় করবে এবং তা প্রকাশ করবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: সর্বপ্রথম যে কাজটি করতে হবে তা হল, আপনি যদি নিজেকে ওয়াকফ মনে করেন, আপনার মা-বাবা আপনাদেরকে ওয়াকফ করে থাকেন, তবে ভেবে দেখতে হবে যে কি উদ্দেশ্যে করেছেন? তারা তোমাকে কুরআন করীমের সেই আয়াতের অনুসরণের তোমাদের উৎসর্গ করেছেন যেখানে হযরত মরিয়ম (আ.) এর মা বলেছিলেন যা কিছু আমার গর্ভে আছে, সেটিকে আমি তোমার জন্য উৎসর্গ করছি। তাই আপনাদের মাতাপিতা আপনাদেরকে খোদা তা'লার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। অতএব প্রথমে জান যে খোদা কে? আর খোদা তা'লা সৃষ্টির যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন তা প্রণিধান কর। আর তিনি কি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন? 'আমার ইবাদত কর'। অতএব আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী কর। আর এই বয়সে সর্ব প্রথম করণীয় হল তোমাদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। অনেক ছেলেরা নিজেদের বাড়িতে দেখে নেয় যে কত বার নামায পড়া হয়। শীত কিম্বা গ্রীষ্মে চরম আবোহাওয়ার কারণে যদি নামায জমা করা হয় বা আমার সফরের কারণে নামায জমা হয়, তবে মনে করে তিন বেলার নামায রয়েছে। তাই মনে রেখো যে নামায পাঁচ বেলার। আর যথা সময়ে নামায পড়। প্রথমত আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক তৈরী কর। এরপর ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ কর। কুরআন অধ্যয়ন কর, এর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ কর, অনুধাবন কর। এটি হল পথনির্দেশনার এক অসীম সম্ভার। যে বোর্ডগুলি লাগানো আছে সেগুলির উপর আমল করার চেষ্টা কর। একজন ওয়াকফে নওকে এইসব কাজই করা উচিত।

একজন ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে যে, আমি কি আপনাকে একটি নযমের দুটি পঙক্তি শোনাতে পারি?

হুযুর মৃদু হেসে বলেন, এটি তো উত্তর, প্রশ্ন হল না। শোনাও তবে।

আরও এক ছাত্র প্রশ্ন করে যে, হযরত নূহ (আ.)-এর নৌকা তৈরী হতে কত সময় লেগেছিল? আর অন্য কোনও প্রাণী কি তাকে সাহায্য করেছিল?

হুযুর আনোয়ার বলেন: সময়ের কথা বলা নেই। যখন তিনি নৌকা তৈরী করছিলেন, সেই সময় তাঁর সঙ্গে যে সব লোকেরা ছিল তারা সেখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। কুরআন শরীফে একথাই লেখা আছে যে, তারা ঠাট্টা করে বলত, যে আমাদের এখানে তো পানি নেই, কিছুই নেই। তবে এই নৌকা কি জন্য তৈরী করছ? হযরত নূহ (আ.) তাদের এই উত্তরই দিয়েছিলেন যে, আজ তোমরা আমাকে বিদ্রুপ করছ। কাল যখন তোমরা এই গুরুত্ব অনুধাবন করবে, তখন আমি তোমাদেরকে নিয়ে বিদ্রুপ করব। নৌকা তৈরীতে কিছুটা সময় অবশ্যই ব্যয় হয়েছিল। আর যারা তাঁকে মান্য করত, তারাই হয়তো তাঁকে সাহায্য করেছিল। নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করে নিখুঁত সময় বলা সম্ভব নয়।

এক ছাত্র বলে, 'আপনি আমাকে একটি কলম দেবেন?'

হুযুর বলেন, 'এটা তো অনেক বড় প্রশ্ন, বস। অন্য কোন সময় অফিস থেকে নিয়ে নিও।'

এক ছাত্র বলে,আমার প্রশ্ন হল, জামেয়াতে আমরা নিজেদের পছন্দমত পোশাক কেন পরতে পারি না?

হুযুর বলেন, কে বলেছে যে পরতে পারবে না?

ছাত্রটি বলল, আমি জামেয়ায় গিয়ে দেখলাম, সকলেই একই ধরণের পোশাক পরে আছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, 'তোমাদের স্কুলে ইউনিফর্ম নেই?

ছাত্রটি উত্তর দিল, 'ইউনিফর্ম নেই।'

হুযুর আনোয়ার বললেন, 'তোমাদের স্কুলে ইউনিফর্ম নেই! সব স্কুলেই তো ইউনিফর্ম থাকে। ইউকের প্রায় প্রত্যেক স্কুলেই তো ইউনিফর্ম আছে। পাকিস্তানের প্রায় স্কুলে ইউনিফর্ম আছে। এখানকার পাবলিক স্কুলে হয়তো নেই। হয়তো 'কমন' রাখতে বলেছে। কিম্বা অভাবপীড়িতদের জন্য বা অন্য কোন কারণে হয়তো নেই। কিন্তু যে প্রাইভেট স্কুলগুলি রয়েছে, আমার মতে জার্মানীতে ইউনিফর্ম অবশ্যই থাকবে। তাদের নিজের এক পরিচিতি আছে। জামেয়ার ছাত্রদেরও কোন না কোন পরিচিতি দিতে হত বলেই আমি এই ইউনিফর্ম পছন্দ করেছি। এটি শরিয়তের কোন বিষয় নয়, ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়।

এক কিশোর বলে, হুযুর! আমি কি নযমের দুটি লাইন শোনাতে পারি? আমি নানাকে কথা দিয়ে এসেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, কথা না রাখলে কি বলেছেন, মারবেন? বেশ, শোনাও।

এক কিশোর প্রশ্ন করে যে আপনি সম্প্রতি আখন' শহরের মসজিদ উদ্বোধন করে এসেছেন। সেখানকার মসজিদ কেমন লেগেছে?

হুযুর তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে সে আখন শহরে বাস করে কি না আর জুমা কোথায় পড়ে? ছেলেটি উত্তর দেয়,সে আখন সংলগ্ন জামাতের সদস্য আর সে নিজের জামাতেই জুমা পড়ে।

হুযুর বলেন: সব মসজিদই ভাল। প্রত্যেক সেই মসজিদ ভাল যার নামাযীর সংখ্যা ভাল। মসজিদের ইমারত সুন্দর করে গড়ে তোল, কিন্তু মসজিদের প্রকৃত সৌন্দর্য সেখানকার নামাযীদের দ্বারা প্রকাশ পায়। দেখা যাক, সেখানকার জামাত এটিকে আরও কতটা সুন্দর বানায়।

এক কিশোর নিবেদন করে, 'আমি আবিটুর এর পর জামেয়ায় যেতে চাই। জামেয়ায় থাকাকালীন আরও কিছুও কি পড়তে পারি কি না?

হুযুর আনোয়ার বলেন, জামেয়াতে পড়াশোনা করাই ভাল। জামেয়ায় থাকাকালীন কেবল জামেয়ার পড়াশোনা করাই বেশি ভাল। তুমি যদি জামেয়া কর্তৃপক্ষের নিকট অত্যন্ত মেধাবী হিসেবে প্রমাণিত হও আর তারা তোমাকে আরও কিছু পড়াতে ইচ্ছুক হয় তবে অনুমতিও দেওয়া যেতে পারে। পাকিস্তানে অনেক সময় জামেয়ার কিছু ছাত্রকে এফ.এ কিম্বা স্নাতক করানো হয়, যারা তুলনায় বেশি মেধাবী। কিন্তু যদি বোঝা যায় যে ছাত্রটি মেধাবী এবং বিশেষ কোনও বিষয়ের প্রতি তার ঝোঁক আছে, তবে তাকে সেই বিষয়ে সাম্মানিক কোর্সে ভর্তি করানো যেতে পারে। এটা জামেয়া পাস করার পরও করা হয়। এখানে যুক্তরাজ্যের কিছু ছাত্রও এমন বের হয়েছে যাদেরকে আমরা বিভিন্ন বিষয়ে ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক করাচ্ছি।

এক কিশোর প্রশ্ন করে,'যারা মৃত্যু বরণ করে, আমরা তাদেরকে

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

খোদাতালার অভিশাপ হইতে অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত থাকিও কেননা তিনি অতি পবিত্র এবং আত্মমর্যাদাভিমানী।"

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ১৪)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin , Barisha (Kolkata)

মাটিতেই কেন সমাধিস্থ করি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, মাটিতে সমাধিস্থ করি, কারণ মৃত ব্যক্তির সম্মান অবশ্যই হওয়া উচিত। ইসলামে একটি ধারণা আছে যে সসম্মানে ভূ-গর্ভে সমাধিস্থ করে দাও। আর সেখানে একটি চিহ্ন রেখে দাও যাতে জানা যায় যে এখানে কেউ সমাহিত আছে। এরপর সেই কবরে গিয়ে দোয়া কর। কিছুকাল পর মাটির মধ্যে সেই সমস্ত জিনিস তো আর থাকবে না। যাকেই দফন করা হয়,সে তো মাটির সঙ্গেই মিশে যায়। আমরা যেখানে কবরস্তানে কাউকে দফন করি, হতে পারে হাজার হাজার কবর আগে থেকেই সেখানে আছে। যেখানে তোমরা বাড়ি তৈরী করছ, সেই সব জায়গা হয়তো আগে কখনও কবরস্তান ছিল। যাইহোক সম্মান প্রদর্শন, স্মৃতি রক্ষা এবং সেখানে গিয়ে দোয়া করার জন্য ইসলামে এই পদ্ধতি রয়েছে। প্রত্যেক জাতিই তাদের মৃতদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে চায়। খৃষ্টানরাও সমাধি দেয়, কিন্তু কিছু জাতি এমনও আছে যারা মনে করে মৃতদেহকে পুড়িয়ে দেওয়াই সম্মানের। হিন্দুদের মধ্যে মৃতদেরকে পুড়িয়ে দিয়ে তার চিতাভস্ম সংরক্ষণ করে রেখে দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। তাদের মতে এটি বেশি সম্মানজনক পন্থা। একইভাবে পারসীরা বড় বড় উঁচু মিনার তৈরী করে রাখে যেখানে একটি গ্রীলের মত তৈরী করা থাকে, যার উপর তারা মৃতদের ঝুলিয়ে রাখে। সেখানে কাক, চিল ইত্যাদি পাখি তাদেরকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। তারা মনে করে, আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবেরা মৃত্যুর পরও এর থেকে উপকৃত হচ্ছে, এটিই বেশি সম্মানের। তাই এটি সম্মান সম্পর্কে একটি দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র। প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব রীতি রয়েছে। ইসলামের মতে মাটিতে সমাধিস্থ করাই হল শ্রেষ্ঠ পন্থা। কুরআন করীমও এই শিক্ষা প্রদান করেছে। কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি যখন তার অপর ভাইকে হত্যা করল, তখন আল্লাহ্ তা'লা তাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি কাককে পাঠিয়ে দেখালেন যে কিভাবে মৃতকে দফন করতে হয়। সে মাটি খুঁড়ল। সে বলল, আমি এমনই হতভাগা যে নিজের ভাইকে সম্মান করছি না। তার সম্মান হিসেবে তাকে মাটিতে দফন করা উচিত। আর সেখানে স্মারকও থেকে যায়। এরপর দোয়াও করা যায়।

এক কিশোর প্রশ্ন করে যে, হুযুর আনোয়ার (আই.) এর যদি পাকিস্তানে থাকার অনুমতি থাকত তবে তিনি কোথায় থাকতে পছন্দ করবেন- ইংল্যাণ্ডে না কি পাকিস্তানে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: পাকিস্তানে থাকার অনুমতি পাইয়ে দাও, পাকিস্তানে চলে যাব। পাকিস্তানে থাকার অনুমতি এমনিতেই আছে। কিন্তু আমি পাকিস্তানে থেকে নামায পড়তে পারব না, খুতবা দিতে পারব না কিম্বা এমন কোন কাজ করতে পারব না যা আমার জন্য করণীয়। সেই কারণে, ইনশাল্লাহ্ যখন পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে, আর তা যে খিলাফতকালেই হোক, আল্লাহ্‌ই উত্তম জানেন, আমার মতে তখন কিছু কালের জন্য খলীফাতুল মসীহ পাকিস্তানে যাবেন কিম্বা আমিই যদি সুযোগ পাই তবে যাব। কিন্তু বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থাপনা এবং যেভাবে জামাত আহমদীয়া বিস্তৃতি লাভ করেছে, আর এই যে দেশটি এত উন্নতি লাভ করেছে, যদি পাকিস্তান এতটা উন্নতি করে যতটা ইউরোপ করেছে তবে কিছুকাল সেখানে থাকবে আর এখান থেকে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। সঠিকভাবে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা বেশি সমীচীন হবে। তাই আমি মনে করি, ইংল্যান্ড যেহেতু একটি ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে আর বেশির ভাগ কাজ এখান থেকেই হবে, কিন্তু কাদিয়ান এবং পাকিস্তানেও যাতায়াত অব্যাহত থাকবে। তাই যুক্তরাজ্যেই হয়তো আমাদের কেন্দ্রকে আরও সম্প্ররাতি করতে হতে পারে।

এক কিশোর প্রশ্ন করে যে, হুযুর আনোয়ার জামাতের জন্য এত বেশি কাজ করেন, আপনার কাছে কি অবসর সময় থাকে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, যদি ঘুমাই তবে তা ফ্রি-টাইম পেলে তবেই ঘুমাই। কাজ তো থাকেই, কিন্তু সেই সব কাজের মধ্যেও কখনও কখনও সময় বের করতে হয়। কখনও বছরে দুএকবার কয়েকদিনের জন্য বাইরে বেরোতে হয়। শুটিং এর প্রতি আমার আগ্রহ রয়েছে। তাই আমি কখনও কখনও দুই তিন ঘন্টার জন্য শুটিং এ চলে যাই।

এক ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে যে, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যদি কোনও বার্তা লাভ হয় তবে তা আপনি কিভাবে বুঝতে পারেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, প্রত্যেক পুণ্যের কথা আল্লাহ্ তা'লাই মানুষের হৃদয়ে সঞ্চার করেন। হৃদয়ে সঞ্চারিত হওয়ার পর বার বার এই স্পৃহা জাগে যে এই কাজটি করতে হবে। অনেক সময় মনের মধ্যে অনেক বিষয় থাকে। কিন্তু নামাযের সময়, যেমন অনেক সময় জানা যায় যে, এদিকে মনোযোগ দিতে হবে। তাই এভাবে বোঝা যায় যে, এটি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকেই এসেছে।

সেই কিশোর পুনরায় প্রশ্ন করে যে, হুযুর আনোয়ার কি ফেরেশতাদের দেখতে পান?

হুযুর আনোয়ার বলেন,ফেরেশতাদের দেখানো হয় না। আঁ হযরত (সা.) এর উপর জিবরইল (আ.) এসেছিলেন আর বিভিন্ন রূপে তাকে দেখানো হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন নবীর উপর যে ফেরেশতা এসেছেন, তারা বিভিন্ন রূপ নিয়ে এসেছেন। আর আঁ হযরত (সা.) এর মাধ্যমেই তাঁর সঙ্গে সাহাবারা একবার এক ফেরেশতাকে দেখেন, যিনি আরকানে ইসলাম এবং আরকানে ঈমান শেখাচ্ছিলেন।

এক কিশোর প্রশ্ন করে যে, হুযুর আনোয়ার জামাত আহমদীয়া জার্মানীর মধ্যে কি দেখতে পাচ্ছেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, তোমরা এত মানুষ বসে আছ, ওয়াকফীনে নও দেখতে পাচ্ছি। তুমি কি জিজ্ঞাসা করছ যে আমি এর ভবিষ্যত কি দেখতে পাচ্ছি? আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমি আশা করি ইনশাআল্লাহ্ জামাত আহমদীয়া জার্মানীর ভবিষ্যত বেশ উজ্জ্বল। জামাত এখানে বিস্তার লাভ করবে আর জার্মান জাতিও ইনশাআল্লাহ্ আহমদীয়াত এবং প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করবে। খুব সম্ভব তারা ইউরোপে জামাত গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রথম সারিতে অবস্থান করবে। এ প্রসঙ্গে আমি খুতবায় উল্লেখ করে এসেছি। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)ও উল্লেখ করেছেন আর অন্য কেউ হয়তো উল্লেখ করেছিলেন।

এক ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে যে, মানুষ মৃত্যুর পর জান্নাতে যায় অথবা জাহান্নামে। তবে পশুদের মৃত্যুর পর তাদের কি হয়?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে কোনও বিধিনিষেধ মেনে চলার ক্ষমতা দেন নি। জান্নাত ও জাহান্নাম কার জন্য? কেউ শাস্তি পায়, ভাল এবং মন্দ কর্মের জন্য প্রতিদান ও শাস্তি রয়েছে। কেউ যদি কোন পুরস্কার পায় তবে তা সৎকর্মের প্রতিদানে পেয়ে থাকে। আর যদি তুমি কোন অন্যায় কাজ কর তবে অল্প হলেও শাস্তি পাবে। স্কুলেও শাস্তি পাওয়া যায়। কিন্তু পশুদের কি সেই বুদ্ধি আছে? কুকুর বেড়ালদের কি এমন বুদ্ধি আছে যে ভাল কাজ করতে হবে আর মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে? আল্লাহ্ তা'লা তাদের যে প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন, সেই অনুসারেই তারা কাজ করবে। তাই তাদের শাস্তি বা পুরস্কার বলে কিছু নেই।

এক ওয়াকফে নও কিশোর নিজের দুটি প্রশ্ন উপস্থাপন করে। প্রথম প্রশ্ন হল এই যে, মৃত্যুর পর মানুষ যখন খোদা তা'লার কাছে যায়, তখন শরীর কি তেমনিই থাকে যেমনটি এখন আছে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: শরীর মাটিতে সমাহিত হয়ে যায় আর আত্মা উপরে চলে যায়। আত্মা উপর চলে যাওয়ার পর আল্লাহ্ তা'লা সেটিকে এক নতুন দেহ দান করেন। আর যতদিন আল্লাহ্ তা'লা চান সেই শরীরে থাকবে কিম্বা জাহান্নামে থাকবে, শাস্তি ভোগ করবে নাকি জান্নাতে যাবে এবং তাঁর কল্যাণে ভূষিত হবে। এই পার্থিব শরীর এখানেই থেকে যাবে। পরকালে নতুন দেহ দেওয়া হবে আর আত্মা একই থাকবে।

কিশোর প্রশ্ন করে যে, ওয়াকফে নও কি পুলিস অফিসার

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা কুরআন শরীফকে বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ কর এবং ইহার সাথে সহিত গভীর ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন কর; এরূপ ভালবাসা যাহা অন্য কাহারও সাথে তোমরা কর নাই **(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)**

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Badruddin Sb. (Neogirhat, West Bengal)**

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমাদিগকে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ধর্মগ্রন্থ তোমাদিগেক দান করা হইয়াছে তাহা যদি খৃষ্টানদিগকে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইত না। **(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)**

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura**

হতে পারে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, যদি জামাত আহমদীয়ার পুলিস হয় তবে হতে পার। কিন্তু তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি পুলিসে যায় তবে অনুমতি নিয়ে যেতে পারে, এই বলে যে তার এতে আগ্রহ আছে। অনুমতি পাওয়ার পর যেতে পার। অন্যথায় নয়। এটি নীতিগত সিদ্ধান্ত নয়। প্রত্যেক ব্যক্তির পরিস্থিতি বিচারে সিদ্ধান্ত ভিন্ন হবে।

এক ওয়াকফে নও কিশোর প্রশ্ন করে যে, মৃত্যুর পর আমাদের আত্মা যখন উপরে চলে যাবে, তখন কি আমরা আল্লাহ্‌কে দেখতে পাব?

হুযুর আনোয়ার বলেন, মৃত্যু নিয়ে আজকাল জার্মানীদের খুব কৌতুহল। এখন আমরা জীবিত আছি। এখনও জীবিতদের জগতে বাস করছি। জীবন নিয়েও ভাবিত হও। তবে মৃত্যু নিয়ে চিন্তিত হতে হলে আতফালুল আহমদীয়ার পরিবর্তে আনসারুল্লাহ্‌র বেশি চিন্তিত হওয়া উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কাছে যখন জবাবদিহি হবে, তবে স্পষ্টতই কোন রূপে তিনি প্রকাশিত হবেন। আল্লাহ্‌ই উত্তম জানেন যে তিনি নিজেকে কিরূপে প্রকাশ করবেন! আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'আমি প্রশ্ন করব'। তিনি বলবেন, যদি তুমি সৎকর্ম করে থাক তবে জান্নাতে যাও। একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, খোদা তা'লা কাউকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন এবং এরপর একটি দৃশ্য দেখানোর জন্য সামনে আনবেন। পরবর্তী পদক্ষেপে সে জান্নাতের দরজায় পৌঁছাবে। তখন বান্দা বলবে, আল্লাহ্, এখানে সুশীতল বাতাস বইছে। এই দৃশ্যও দেখানো হয়েছে আর এই দৃশ্যও দেখানো হয়েছে। একেবারে দরজায় নিয়ে এসেছেন, যেন দরজায় উঁকি মেরে ভিতরে দেখছি, লোকেরা আমোদিত হচ্ছে, আরও একটু ভিতরে গিয়ে কাছে থেকে দেখব কি? আল্লাহ্ তা'লা তখন হেসে বলবেন, 'যাও, তোমার একটু বেশিই আগ্রহ, যাও তোমাকে ক্ষমা করলাম, জান্নাতে যাও। এটি একটি দীর্ঘ হাদীস, আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম।

আরও এক ওয়াকফে নও প্রশ্ন করে যে, আহমদী ছেলেরা স্মার্টফোন নিতে পারে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আহমদী ছেলেদের স্মার্ট ফোন রাখার অনুমতি আছে, তবে এই শর্তে যে যদি তারা এর অপব্যবহার না করে আর তোমাদের মা-বাবাও এতে সম্মত হন। কিন্তু তোমরা যদি সারা দিন চ্যাট করতে থাক আর মোবাইল দেখতে থাক আর বাজে ধরণের এ্যাপ তাতে রেখে দাও আর পুণ্যবান না হয়ে বাজে বিষয় শিখতে থাক। তবে আমার মতে এমনটি হওয়া উচিত নয়। তোমাদের অবস্থা দেখেই তোমাদের বাবা-মা সিদ্ধান্ত নিবেন যে তোমাদেরকে তা দেওয়া যায় কি না। তোমরা আমার কাছে নীতিগত অনুমতি নিয়ে বাবা-মার কাছে একথা যেন বলো না যে অনুমতি পেয়ে গেছ।

আরও এক ওয়াকফে নও তিফল প্রশ্ন করে যে, ফেসবুক ব্যবহার করা নিষিদ্ধ কেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, এটি কোনও শরিয়তের আদেশ নয়। শরিয়তে তো নিষিদ্ধ নয়। আমি এজন্য নিষেধ করেছিলাম যে, ইদানিংকালে লোকেরা মন্দের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে আর সৎকর্ম কম করে। কিন্তু জামাত আহমদীয়া ফেসবুক পেজ তৈরী করেছে। আল ইসলাম ওয়েবসাইটের উপরও ফেসবুক আছে। জামাতের অন্যান্য অঙ্গসংগঠনগুলিরও ফেসবুক পেজ আছে। কিছু সাধারণ মানুষ দুইচার জন মিলে একটি ফেসবুক পেজ তৈরী করেছে, যার মাধ্যমে তারা তবলীগ করে থাকে। এটি তো অবৈধ নয়। কিন্তু সচেতনার সাথে ব্যবহার করার জন্য একটি সীমা পর্যন্ত সতর্কতা অলম্বন করা উচিত। তোমরা যখন সাবালক হবে, তখন তোমরাও ব্যবহার করো। কেননা ফেসবুকের মাধ্যমে অনেক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটছে। কয়েক শ্রেণীর মানুষ কিছু লোককে অসৎ পথে নামিয়েছে, কিছু ছেলেদের দ্বারা অপরাধমূলক কাজ করিয়েছে। এরপর তাদেরকে ব্ল্যাকমেল করে, অপরাধের পথে চালিত করে, তাদেরকে জামাত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তোমরা এখনও জামাত সম্পর্কে ততটা জ্ঞান অর্জন কর নি। প্রথমে জামাত সম্পর্কে ভালভাবে জান এর পর ধর্ম বিষয়ক কোনও ফেসবুক পেজে যাও। এছাড়াও সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কেও তোমাদের এতটা তথ্য থাকা উচিত যে ফেসবুকে যে সমস্ত প্রশ্ন উঠে আসে, তোমরা সেগুলির উত্তর যেন দিতে পার। এখনও তোমরা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। আর তোমাদের বাবা-মাও যদি সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেন, তবে তোমরা মনে করবে যে, ফেসবুকে যে ব্যক্তি তোমাকে এপ্রোচ করছে, সে ঠিক বলছে। অথচ তোমার সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা, জামাতের কোনও শিক্ষিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা কিম্বা মুরুব্বী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল। তাই ফেসবুকে এমন অনেক বিষয় এসে যায়, যার দ্বারা মন্দের বিস্তার হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং বাস্তবে তা ঘটেও থাকে। ইউরোপে অনেকে এমন আছেন, আমেরিকাতেও আছেন, যারা স্বীকার করেছেন যে, ফেসবুক তাদেরকে ভুল পথে নিয়ে গেছে। এই জন্য আমি বলেছিলাম যে, এর থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করা উচিত। ফেসবুকে যদি যেতেই হয়, তবে জামাতী ফেসবুক আছে, সেখানে যাও।

এক কিশোর প্রশ্ন করে যে, যদি কোনও জার্মান নাগরিক কিম্বা অন্য কেউ আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি কি করে জানলে যে ইসলাম সত্য ধর্ম? তবে আমরা তাকে কিভাবে উত্তর দিব?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: দেখ, সর্বপ্রথম বিষয়টি হল, সব থেকে বড় জীবন্ত প্রমাণ এই যে, কুরআন করীম দাবি করেছে, এই কুরআন নিজের প্রকৃত রূপে সংরক্ষিত থাকবে। চৌদ্দশত বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, এটি আজও সংরক্ষিত আছে। তওরাত এবং অন্যান্য গ্রন্থ যেমন- ইঞ্জিল, বাইবেল এবং অন্যান্য ঐশী গ্রন্থসমূহ যেগুলি বিভিন্ন নবীদের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল, সেগুলি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সংরক্ষিত ছিল, যতদিন সেগুলির শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। অতঃপর সেগুলির মধ্যে বিকৃতি দেখা দিয়েছে। বাইবেলও বিকৃত হয়েছিল, তওরাতও বিকৃত হয়েছিল। এই কারণেই তো ইহুদীরা আঁ হযরত (সা.)-এর যুগেও তওরাত মেনে চলত না। কিন্তু কুরআন করীমের দাবি, এটি চিরকাল সংরক্ষিত থাকবে। এটিও আজও অক্ষত আছে। তোমাদের কাছে ছাপানো অবস্থায়, গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত আছে। কুরআনের অনেক হাফেয কুরআন মুখস্ত করে নেয়, লক্ষ লক্ষ হাফিজ কুরআন মুখস্ত করে রেখেছে, যাদের বুকের মধ্যে কুরআন সংরক্ষিত আছে। এছাড়া আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে এর আয়াতসমূহ পাঠ করে থাকি, কুরআন করীম তিলাওয়াত করে থাকি। তাই এটি অনেক বড় একটি প্রমাণ যে, কুরআন করীমের মাধ্যমে যে শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে, তা সত্য শরিয়ত আর দাবি করা হয়েছে যে এটি চিরকাল অক্ষত থাকবে এবং থেকে এসেছে। এটি অনেক বড় একটি দলিল। এছাড়া আঁ হযরত (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে, যে ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এসেছেন। তিনি দাবি করেছেন এবং জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমরা জামাতের কাজ, ইসলামের কাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছি। আর অন্য যে সমস্ত মানুষ আছেন, তারা ইসলামের শিক্ষার উপর এই আমল করে এর মিশনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না। যেমন খৃষ্টধর্ম এক যুগে বিস্তার লাভ করেছিল ঠিকই, কিন্তু পরে তা মানুষের স্বভাব অনুযায়ী নিজের শিক্ষাকে পরিবর্তিত করতে থাকল। আফ্রিকাতে ভিন্ন এক উপায়ে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, ইউরোপে অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে। এছাড়া তারা ক্রমশ এই ধর্মকে বর্জনও করছে আর ইসলাম গ্রহণ করার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতি বছর আহমদী মুসলমানও হচ্ছে। আমি প্রধান প্রধান বিষয়গুলি উল্লেখ করলাম। খোদা তা'লা আহমদীদের দোয়া গ্রহণ করে থাকেন। তোমাদের দোয়া কখনও গৃহীত হয়েছে? একথা শুনে ছেলেটি মাথা নাড়ায়। হুযুর বলেন, এটিও তো সত্যতার প্রমাণ। অনেকগুলি দলিল দিও আর সঙ্গে নিজেদের দোয়া গৃহীত

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা যদি চাও যে, আকাশে আল্লাহতালা তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে তোমরা সহোদর দুই ভ্রাতার ন্যায় পরস্পর এক হইয়া যাও।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)**

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমাদের মধ্যে সে-ই অধিক মহৎ, যে আপন ভাইয়ের অপরাধ অধিক ক্ষমা করে এবং হতভাগ্য সে, যে হঠকারিতা করিয়া ক্ষমা করে না।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 7 Jan, 2021 Issue No.1

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(খুতবার শেষাংশ..)

সালে জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীন থেকে পড়াশোনা শেষ করার পর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও পরিশ্রমের সাথে জামা'তের কাজ করতে থাকেন; এদিক থেকে মরহুম মোট ১৭ বছর জামা'তের কাজ করেছেন। মরহুম অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, ধার্মিক, আনুগত্যশীল, নামাযের ব্যাপারে একনিষ্ঠ এবং জামা'তের প্রতি অনুরক্ত একজন মু য়াল্লেম ছিলেন। তিনি তার পেছনে সহধর্মি ণী ছাড়াও দুই পুত্র ও দু'জন কন্যা রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন এবং তার স্ত্রী-সন্তানদের আন্তরিক প্রশান্তি দান করুন।

পরবতী জানাযা পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার মুয়াল্লেম সিলসিলা মোকাররম সিরাজুল ইসলাম সাহেবের। তিনি ঐশী তক্বদীর অনুসারে গত ১৪ অক্টোবর ২০২০ তারিখে ষাট বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ-।

মরহুম মুয়াল্লেম সাহেব ২০০২ সালে জামেয়াতুল মুবাশ্বেরীন, কাদিয়ান থেকে ছয় মাসের মুয়াল্লেম প্রশিক্ষণ নেন এবং ২০২০ পর্যন্ত খণ্ডকালীন মুয়াল্লেম হিসেবে সেবা করতে থাকেন; এই হিসাব অনুসারে মরহুম মুয়াল্লেম সাহেবের সেবাদানকাল ১৮ বছর হয়েছে। মরহুম অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, ধার্মিক, আনুগত্যশীল, নামায-রোযার ব্যাপারে একনিষ্ঠ, জামা'তের প্রতি অনুরক্ত, পরিশ্রমী মুয়াল্লেম ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে মরহুম তার সহধর্মিণী ছাড়াও তিনজন কন্যা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। বড় দু'কন্যার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তৃতীয় কন্যা অধ্যয়নরত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ আচরণ করুন এবং তার নিকটজনদের ধৈর্য দান করুন ও তার পুণ্যসমূহ চলমান রাখার সৌভাগ্য দিন।

তৃতীয় জানাযা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৌহিত্র ও হযরত নওয়াব মুহাম্মদ আলী খান সাহেবের পৌত্র এবং হযরত নওয়াব আমাতুল হাফিয বেগম সাহেবা ও হযরত নওয়াব আব্দুল্লাহ্ খান সাহেবের পুত্র মোকাররম শাহেদ আহমদ খান পাশা সাহেবের। তিনি গত ২৬ অক্টোবর তারিখে ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ-। তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। মরহুম আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওসীয়্যতকারী ছিলেন। মোকাররম শাহেদ আহমদ খান সাহেব দুই বিয়ে করেছিলেন। প্রথম বিয়ে ১৯৬২ সালে মোকাররমা আমাতুশ্ শাকুর সাহেবার সাথে হয়েছিল, যিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের কন্যা ছিলেন। আর সেই বিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) -এর অসুস্থতার কারণে মওলানা জালালুদ্দীন শামস সাহেব পড়িয়েছিলেন। প্রথম পক্ষে তার পাঁচজন সন্তানসন্ততি রয়েছেন- দু'জন পুত্র এবং তিনজন কন্যা। তার দ্বিতীয় বিয়ে হয় ১৯৭৭ সালে মরহুম সাঈদ আহমদ সাহেবের কন্যা সামিনা সাঈদ সাহেবার সাথে, যার ঘরে তার এক পুত্র রয়েছে, যিনি বর্তমানে আমেরিকায় আছেন।

নিয়মতান্ত্রিকভাবে জামা'তের কোন কাজের তার তেমন সুযোগ হয় নি, কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের সাথে বাইরের কিছু দেশের সফরে তার যাওয়ার সৌভাগ্য হয় এবং সেখানে সেবা করার সুযোগ হয়। তার সহধর্মি ণী লিখেছেন যে, তার একটি গুণ ছিল তিনি দরিদ্রদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; অনেক দরিদ্র ব্যক্তির ব্যয়ভার নির্বাহ করতেন, এমনকি একটি বাড়িও বানিয়ে দিয়েছিলেন; আর নিয়মিত দরিদ্রদের সাহায্য করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপাসুলভ ব্যবহার করুন; তার সন্তানদেরও জামা'ত ও খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত রাখুন।

পরবতী জানাযা যুক্তরাজ্যের শেফিল্ড নিবাসী মুকাররম সৈয়্যদ মাসউদ আহমদ শাহ্ সাহেবের। গত ৮ সেপ্টেম্বর তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ-।

তার বংশে আহমদীয়াত প্রবেশ করে তার পিতা সৈয়্যদ নাযেম হোসেন সাহেব (রা.)-এর মাধ্যমে, যিনি ১৯০২ সালে ২০ বছর বয়সে কাদিয়ানে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেন। সৈয়্যদ মাসউদ আহমদ শাহ্ সাহেব ১৯৬২ সালে যুক্তরাজ্যে আসার পর স্থায়ীভাবে শেফিল্ডে বসবাস আরম্ভ করেন। শেফিল্ডে জামা'ত প্রতিষ্ঠার পর তার আবাসগৃহেই প্রথম নামায সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয় আর ১৯৭০ সাল পর্যন্ত তিনিই জামা'তের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। অতঃপর ১৯৯৭ সাল থেকে শুরু করে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সেক্রেটারী যিয়াফত হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। মরহুম প্রসন্নচিত্ত, আতিথিপরায়ণ, ভদ্রজন, সেবার প্রেরণায় সমৃদ্ধ, গরিবের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং এক নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত মানুষ ছিলেন। খিলাফতের সাথে অশেষ বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। তার মেয়ে ডাক্তার আয়েশা সাহেবা বলেন, আমাদেরকে জামা'ত আর বিশেষভাবে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত করতে তিনি সদা সচেষ্ট থাকতেন আর প্রত্যেক ৬ মাস পরপর যুগ খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করার উপদেশ দিতেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের কন্যা এবং স্ত্রীকে ধৈর্য ও মনোবল দিন। মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন। আল্লাহ্ তা'লা তার এক মাত্রকন্যা ও স্ত্রীকে মরহুমের পুণ্যসমূহ ধরে রাখার সামর্থ্য দিন।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

****

হওয়ার প্রমাণটিও দিও।

এক কিশোর প্রশ্ন করে যে, হুযুর আনোয়ার একটি খুতবায় আতফালুল আহমদীয়াকে মোবাইল রাখতে নিষেধ করে বলেন, এটি আমাদের জন্য রাখা নিষিদ্ধ, কেননা, আমরা কোনও ব্যবসা করি না বা এমন কোনও কাজও করি না, যার জন্য আমাদের মোবাইলের প্রয়োজন হতে পারে। আমি একথাও শুনেছি যে, আতফাল থেকে খুদ্দামে উপনীত হওয়ার মোবাইল রাখা যায়। আমার প্রশ্ন হল, একজন তিফল পনোরো বছর বয়সে উপনীত হলে কি তার জন্য মোবাইল রাখার অনুমতি আছে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, প্রশ্ন হল, মোবাইল রাখা তো কোনও পাপের কাজ নয়। যদি প্রয়োজন থাকে, কিছু বাবা-মা অত্যন্ত সংবেদনশীল প্রকৃতির হয়ে থাকেন। তারা মনে করেন, সন্তানের সঙ্গে যেন সব সময় তাদের যোগাযোগ থাকে। তারা চৌদ্দ পনেরো বছরে তাদের হাতে মোবাইল দিয়ে দেন। যদি তোমরা এর অপব্যবহার না কর, বর্তমানের মোবাইল বা সেলফোন, কিম্বা আইফোন, আর কি যেন সে নাম বলেছিল- স্মার্টফোন, এছাড়া স্যামসাং ও ইত্যাদি কোম্পানির যে সব এ্যান্ড্রয়েড ফোন রয়েছে, এগুলিতে অন্যান্য এ্যাপ্লিকেশনও যুক্ত হতে পারে। বাজে জিনিষও রাখা হয়। যদি তোমরা এই ফোনগুলিকে ভালকাজে ব্যবহার কর, তবে যেমনটি আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সেক্ষেত্রে কোনও অসুবিধা নেই। বাবা-মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে যদি ব্যবহার কর তবে কোনও অসুবিধে নেই। বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে পড়াশোনার বিষয়ে জানতে মেসেজ কর বা যোগাযোগ কর, কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু যদি তোমরা ভাল কাজের পরিবর্তে বাজে ধরণের এ্যাপের পিছনে সারা দিন ব্যয় কর আর গেম নিয়ে পড়ে থাক, আর নামায ত্যাগ কর, সারা দিন বাজে ফিল্ম দেখে কাটিয়ে দাও, যার কারণে তোমাদের চারিত্রিক অধঃপতন হয়। (ক্রমশ...)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের শত শত আদেশের মধ্যে একটি ছোট্ট আদেশকেও লংঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Harhari (Murshidabad)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir